শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের পরিচয়

অক্ষয়কুমার সেন (১৮৫৮ -১৯২৩) -- বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা হলধর সেন। মাতা বিধুমুখী দেবী।

ঘণ কৃষ্ণবর্ণ, রুগ্ন শরীর এবং মন্দ আকৃতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ রহস্যচ্ছলে তাঁহাকে 'শাঁকচুন্নী' বলিয়া ডাকিতেন। প্রথম জীবনে অক্ষয়কুমার কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ছেলেদের পড়াইতেন বলিয়া তাঁহাকে 'অক্ষয় মাস্টার' বলিয়া ডাকিতেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তিনি তাঁহার পরবর্তী জীবনে বসুমতী পত্রিকার অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার ঠাকুরের গৃহী ভক্ত, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ কাশীপুরে ঠাকুরের অপর ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং বহুবার ঠাকুরের পবিত্রসঙ্গ লাভ করেন। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার দিনও অক্ষয়কুমার উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর সেদিন অক্ষয়কুমারকে নিজের কাছে ডাকিয়া তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া কানে 'মহামন্ত্র' দান করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরামর্শে, স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে ঠাকুরের লীলা সম্বলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' পদ্যাকারে রচনা করেন। এইটি তাঁহার জীবনের অক্ষয়কীর্তি। তাঁহার প্রণীত অপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা'। এই দুইখানি গ্রন্থের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে তিনি বিশেষ সুপরিচিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির মুহূর্তে অক্ষয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অক্ষয়কুমারের শেষ জীবন স্বগ্রামে অতিবাহিত হয়।

অঘোড় ভাদুড়ী -- শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত। তাঁহার পিতা ডা: বিহারী ভাদুড়ী। কলিকাতা সিমলা অঞ্চলে ১১, মধু রায় লেনে ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রামচন্দ্র দত্তের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে তিনি ধন্য হন। ঠাকুরের কণ্ঠে গান এবং ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিয়া তিনি অভিভূত হইয়া যাইতেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল।

অচলানন্দ তীর্থাবধূত -- তান্ত্রিক বীরভাবের সাধক। পূর্বনাম রামকুমার, মতান্তরে -- রাজকুমার। বাড়ি হুগলী জেলার কোতরং। ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরে। মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতেন। কখনো কখনো সশিষ্য পঞ্চবটীতে সাধনায় বসিতেন। কারণবারি পান করিয়া স্ত্রীলোকসহ বীরভাবের সাধনা করিতেন। এই বীরভাবের সাধনা বিষয়ে ঠাকুরের সহিত তাঁহার বিতর্ক হইত। ঠাকুর তাঁহার বীরভাবের সাধনা সমর্থন করিতেন না। ঠাকুর বলিতেন -- সব স্ত্রীলোক-ই তাঁহার নিকট মায়ের বিভিন্ন রূপ। অচলানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন -- স্ত্রী পুত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের খবর রাখিতেন না। বলিতেন -- ঈশ্বর দেখিবেন। কিন্তু নাম, যশ, অর্থের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল।

অতুলচন্দ্র ঘোষ -- নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। কলিকাতা বাগবাজার অঞ্চলের অধিবাসী। ঠাকুরের ভক্ত। প্রথম দর্শন বাগবাজার দীননাথ বসুর বাড়িতে। প্রথম দিকে তিনি ঠাকুরের কাছ হইতে দূরে থাকিতেন এবং পরিহাস করিয়া ঠাকুরকে রাজহংস বলিতেন। ঠাকুর সেকথা শুনিয়া সস্নেহে তাঁহার এই উক্তির সমর্থন করেন অতুল তাহাতে অভিভূত হন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হন। কল্পতরু অবস্থায় ঠাকুরকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

অধরলাল সেন (১৮৫৫-৮৫) -- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গৃহীভক্তদের অন্যতম। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা রামগোপাল সেন পরম বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। পূর্বপুরুষের

আদি নিবাস হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামে। অধরের জন্মস্থান -- ২৯, শঙ্কর হালদার লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা। বাসস্থান -- কলিকাতার বেনিয়াটোলা। প্রতিভাবান, কৃতীছাত্র অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের fellow এবং Faculty of Arts-এর সদস্য। পাঁচখানি বাংলা কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। প্রথম জীবনে নাস্তিক অধর, আঠাস বৎসর বয়সে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ঠাকুরের প্রমভক্ত হন। প্রথম সাক্ষাতেই ঠাকুর অধরকে কাছে টানিয়া নেন। একদিন ঠাকুর অধরের জিহ্বায় ইষ্টমন্ত্র লিখিয়া দেন এবং ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অধরের বক্ষ ও মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করেন। ধীরে ধীরে অধর দিব্যানন্দে ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পূর্ণ হইতে থাকেন। ঠাকুর বহুবার অধরের বাড়িতে শুভাগমন করিয়া কীর্তনানন্দে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অধরকে নারায়ণ জ্ঞান করিতেন। অধর নানাবিধ কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই কঠোর পরিশ্রমের পর দিনান্তে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। অধরের বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সরকারী কাজে অধরকে ঘোড়ায় চড়িতে হইত। এই ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে একাধিকবার সাবধান করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ একদিন ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া যাওয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময়েও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহাকে স্পর্শ করেন।

অন্নদা গুহ -- নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু। তিনি বরাহনগর নিবাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে অন্নদা অসৎসঙ্গে কাটাইতেন। একদা নরেন্দ্রনাথের উপরেও অন্নদার প্রভাব পড়ে। অন্নদা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্য হন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করিয়া নিজের জীবনধারাকে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অন্নদাকে অহঙ্কারী মনে করিলেও ঠাকুর তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

অন্নদা বাগচী -- (১৮৪৯ - ১৯০৫) -- ২৪ পরগণার অন্তর্গত শিখরবালি গ্রামে জন্ম। পিতা চন্দ্রকান্ত বাগচী। শৈশব হইতেই অন্নদাপ্রসাদের শিল্পচর্চার প্রতি আকর্ষণ ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নব প্রতিষ্ঠিত স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস-এর এনগ্রেভিং ক্লাশে ভর্তি হন। পরে তিনি পাশ্চাত্য রীতির চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়াও তিনি পূর্বোক্ত স্কুলের শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন। পাশ্চাত্য রীতিতে প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া ইনি প্রভূত যশোলাভ করেন। শিল্পবিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকা "শিল্পপুষ্পাঞ্জলি" (১২৯২) প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তঁহার অন্যতম প্রধান কীর্তি 'আর্ট স্টুডিও', প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮)। এই আর্ট স্টুডিও হইতে লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে ছাপা বহু পৌরাণিক বিষয়ক চিত্র সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের বিষয়ক চিত্র সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। পরে শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি তাঁহার অঙ্কিত কিছু চিত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে উপহার দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই চিত্রগুলি দেখিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বঙ্গীয় কলাসংসদ স্থাপিত হইলে অন্নদাপ্রসাদ তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত 'The Antiquities of Orissa' এবং 'বুদ্ধগয়া' নামক গ্রন্থ দুইটিতে অন্নদাপ্রসাদের অঙ্কিত ছবিগুলি বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

অমৃতলাল বসু (১৮৩৯ - ১৯১৩) -- কেশব সেনের অনুগামী। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী গৃহী ব্রাহ্মভক্ত। জন্মস্থান কলিকাতার হাটখোলায়। স্ত্রী বিধুমুখী দেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিয়া অমৃতলালের জীবনধারার উন্নতি ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের চারিত্রিক মহত্ত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং উদারমনোভাব অমৃতকে মুগ্ধ করে। ঠাকুর অমৃতকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ১৮৮৩ সালে ঠাকুর যখন অসুস্থ কেশব সেনকে দেখিতে আসেন তখন অমৃতলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। কাশীপুরে থাকাকালে ঠাকুর অমৃতকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অমৃত ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। সেই সময়ে অমৃতলালের সহিত ঠাকুরের দীর্ঘসময় ধরিয়া কথাবার্তা হয়। পরবর্তী কালে ঠাকুরের প্রতি অমৃতলালের শ্রদ্ধাভক্তির পরিচয় পাইয়া স্বামীজীও খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অমৃতলাল সরকার -- কলকাতায় ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক এবং বিশেষ অনুরাগী। অমৃতলালও চিকিৎসক হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত The Indian Association for Cultivation of Science-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন। অমৃত ঠাকুরের স্নেহলাভে ধন্য হন। অমৃতলাল ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাসী ছিলেন না। ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে মহেন্দ্রলালের নিকট সস্নেহে ইহা উল্লেখ করেন। তিনি অমৃতলালের সরলাতার প্রশংসা করেন। উত্তরে মহেন্দ্রলাল ঠাকুরের প্রতি অমৃতের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের কথা বলেন এবং অমৃত যে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী সেকথাও জানান।

অলকট, কর্ণেল -- প্রসিদ্ধ থিয়োসফিস্ট নেতা। কলিকাতা থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আমেরিকার একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। আধুনিক শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্য তিনি একটি বিদ্যালয়ের স্থাপনের চেষ্টা করেন। পরে কনকর্ড স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে অলকটের উল্লেখ আছে।

অশ্বিণীকুমার দত্ত (১৮৫৬ - ১৯২৩) -- ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বিখ্যাত দেশনেতা ও মনীষী। জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশাল শহরে। তাঁহার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও প্রেম। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। এরপর আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। অশ্বিনীকুমার যেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যান, সেদিন কেশব সেনেরও সেখানে আসিবার কথা ছিল। কেশব ভক্তবৃন্দের সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন অনেক ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয় এবং ঠাকুর -- সমাধিস্থ হন। অশ্বিনীকুমার এইভাবে প্রথম দর্শনেই উপলব্ধি করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, 'প্রকৃত পরমহংস'। ঠাকুরের সহিত তাঁহার চার-পাঁচবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠেন। এই কয়েকবারের সাক্ষাতের অনুভূতি তাঁহার জীবনকে মধুর করিয়া তোলে। অশ্বিনীকুমারের পিতাও ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল নরেন্দ্রের সহিত যেন অশ্বিনীকুমারের পরিচয় হয়। ঠাকুরের এই ইচ্ছা বারো বৎসর পর আলমোড়ায় পূর্ণ হইয়াছিল। কলিকাতাতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

আন্দি -- মথুরবাবুর জানবাজারের বাড়ির এক মহিলা। সখিভাবে সাধনকালে জানবাজারের বাড়ির মহিলাবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কিরূপ অসঙ্কোচ ব্যবহার করিতেন তাহার দৃষ্টান্তরূপে তিনি ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

আশু -- শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় আগরপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ২২ বৎসর বয়সে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তিনি একান্তে ঠাকুরের কাছে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। আশুতোষ বৃদ্ধ বয়সে মাস্টারমহাশয়ের কাছে যাইতেন এবং ঠাকুরের সহিত নিজ সাক্ষাতের বিষয়ে আলোচনা করিতেন। আশুতোষ ঠাকুরের ভাবাবিষ্ট অবস্থা দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন। তিনি ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

ঈশ্বর ঘোষাল -- ডেপুটি। শ্রীশ্রীঠাকুর ছেলেবেলায় কামারপুকুরে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সাজ-পোশাকে ও ব্যক্তিত্বে সাধারণ লোকে ভীত হইত। অধরের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন।

ঈশ্বর চক্রবর্তী -- হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর গ্রামের রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী অতি উন্নত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ইঁহার পুত্র শশী শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে একজন। পুত্র শশী পরবর্তী কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে পরিচিত। ঈশ্বরচন্দ্র পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ

সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শ্মশানে পঞ্চমুন্ডীর আসনে বসিয়া দীর্ঘকাল দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে শক্তিরূপী দেবীর নিত্য পূজার্চনা হইত। পরবর্তী কালে বেলুড় মঠে প্রথমবার দুর্গাপূজার সময় তিনি তন্ত্রধারক ছিলেন। মঠের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ - ১৮৯১) -- মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু দরিদ্রতা তাঁহার বিদ্যর্জনের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধারণ মেধাবী হিসাবে পরিগণিত হন। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, সমৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত বলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন বহুধাবিস্তৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। পিতামাতার প্রতি ভক্তি, জনগণের প্রতি অসীম দয়া, মনুষ্যত্ববোধ, অজেয় পৌরুষ, অগাধ-পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বহুবিধ গুণাবলীর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁহাকে আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক আখ্যা দেওয়া হয়। সীতার বনবাস, কথামালা, বর্ণপরিচয় প্রভৃতি নানা সংস্কারমূলক কার্যে তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য। সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন ছাড়াও শিক্ষাজগতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে তিনি "মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন" প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উক্ত বিদ্যালয়কে তিনি কলেজে পরিণত করেন। ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট কথামৃত প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তা বিদ্যাসাগরের সহিত ঠাকুরের যোগাযোগ ঘটে। ঠাকুর স্বয়ং বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথামৃতে এই সাক্ষাতের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ঠাকুরও বিদ্যাসাগরকে দয়ার সাগর হিসাবে জ্ঞান করিতেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত "মেট্রোপলিটান স্কুলের" বউবাজার শাখায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) কিছুকাল প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ঈশান কবিরাজ (ঈশানচন্দ্র মজুমদার) -- শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগীভক্ত। বরাহনগরে বাড়ি। শ্রী-মর বড়দিদির বিবাহ হয় এই বাড়িতে। মাস্টারমহাশয় এই বাড়ি হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। কবিরাজ মহাশয় ঠাকুরের পূর্বপরিচিত ছিলেন। তিনি কবিরাজীমতে ঠাকুরকে চিকিৎসা করিতেন। ঠাকুরের সহিত ঈশানচন্দ্রের হৃদ্যতা থাকায় ঠাকুর বরাহনগরে তাঁহার বাড়িতেও শুভাগমন করিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -- শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী ভক্ত। বর্তমান ১৯ নং কেশবচন্দ্র স্ট্রীটে তাঁহার বাড়ি ছিল। আদি নিবাস ২৪ পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রাম। A. G. Bengal-এর সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ঈশানচন্দ্র পরম দয়ালু, দানবীর এবং ভক্ত হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে ঈশানচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রিতরূপে পরিগণিত হন। ঠাকুর পরম ভক্তি-পরায়ণ ঈশানচন্দ্রের বাড়িতে কয়েকবার শুভাগমন করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্রের শেষ জীবন ভাটপাড়াতে সাধন-ভজনে অতিবাহিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি ভাটপাড়াতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইঁহার পুত্রগণ শ্রীশচন্দ্র, সতীশচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কৃতী ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র শ্রীমর সহপাঠী, বন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। সতীশচন্দ্র স্বামীজীর সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী গাজিপুরে সতীশচন্দ্রের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

উপেন -- (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) (১৮৬৮ - ১৯১৯) -- জন্ম কলিকতার আহিরীটোলায়। পিতা পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এবং 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রধান

কৃতিত্ব 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' এর প্রতিষ্ঠা এবং সেই সংস্থার মাধ্যমে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণের প্রকাশনা। তিনি 'সাহিত্য পত্রিকা'র সহিত যুক্ত ছিলেন। রাজভাষা, পাতঞ্জল দর্শন, কালিদাসের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি পুস্তকসমূহের সম্পাদক। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অধর সেনের বাড়িতে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, তবে পরবর্তী কালে তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের সেবা করিয়াছিলেন। কৃপাধন্য উপেন্দ্রনাথ জীবনের অধিকাংশ সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অনুরাগীদের সেবায় অতিবাহিত করেন।

উপেন ডাক্তার -- কলিকাতার জনৈক চিকিৎসক। ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য তিনি ঠাকুরের কাছে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কাশীপুরে একবার ঠাকুরের অসুখ বাড়াবাড়ি হওয়ার সংবাদ শোনামাত্রই ঠাকুরের পরমভক্ত নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেদিন গভীর রাত্রে উপেন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং উপেন ডাক্তার সেদিন ঠাকুরের সাময়িক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন।

উমানাথ গুপ্ত (১৫.১১.১৮৩৯ -- ১.১২.১৯১৮) -- চব্বিশ-পরগণার হালিশহরে জন্ম। তিনি সাংবাদিক ছিলেন। উমানাথ গুপ্ত কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ব্রাহ্মভক্ত এবং তাঁর একজন বিশিষ্ট বন্ধুও ছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২৮শে নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ি 'কমল-কুটীর'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। অসুস্থ কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর একদা 'কমল-কুটীর'-এ আসেন। সেদিনও উমানাথ গুপ্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

উলোর বামনদাস (শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়) -- নিবাস নদীয়া জেলার বীরনগর বা উলোতে। উত্তর কলিকাতার কাশীপুরে তিনি মা-কালীর এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে জনৈক বিশ্বাসদের বাড়িতে অবস্থানকালে ঠাকুর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। সেদিন ঠাকুরের কণ্ঠে শ্যামাসংগীত শুনিয়া বামনদাস মুগ্ধ হন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঠাকুরের দর্শন লাভ হওয়াতে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন।

কাপ্তেন (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) -- শ্রীরামকৃষ্ণের নেপালী গৃহীশিষ্য। নৈতিক শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত কর্মযোগী ব্রাহ্মণ। পিতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুবাদার এবং নৈষ্ঠিক শৈব। ধর্মপরায়ণ, সাহসী এবং দেশপ্রেমিক বলিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষগণের খ্যাতি ছিল। তাঁহার স্ত্রী 'গোপাল'-এর উপাসক এবং ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। বিশ্বনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেইহেতু তাঁহাকে দর্শন করা মাত্রই তিনি চিনিতে পারেন। কর্মজীবনে বিশ্বনাথ কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নেপাল রাজ সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তী কালে কর্মকুশলতা এবং সততার জোরে তিনি অধিকতর উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। নেপাল সরকার তাঁহাকে 'ক্যাপ্টেন' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই কারণে ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে 'কাপ্তেন' বলিয়া উল্লেখ করিতেন এবগ তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তিমত্তার প্রশংসা করিতেন। ঠাকুরের সহিত বেদ-বেদান্ত, ভাগবত-গীতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার গূঢ় আলোচনা হইত। প্রায়ঃশই তিনি ঠাকুরকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা এবং নিশ্চল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গোঁড়ামির জন্য তিনি কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ঠাকুরের যাতায়াত পছন্দ করিতেন না। কর্ম এবং ধর্ম তাঁহার জীবনে সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছিল।

কালিদাস সরকার -- ইনি জনৈক ব্রাহ্মভক্ত এবং কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরকে দর্শন করেন।

কালী [কালীপ্রসাদ চন্দ্র] (২.১০.১৮৬৬ -- ৮.৯.১৯৩৯) -- কালীপ্রসাদ পরবর্তী কালে স্বামী অভেদানন্দ

হিসাবে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কালীপ্রসাদ অন্যতম। জন্ম উত্তর কলিকাতার নিমু গোস্বামী লেনে, মাতা নয়নতারা দেবী। পিতা রসিকলাল চন্দ্র "ওরিয়েন্টাল সেমিনারী" স্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন। কালীপ্রসাদ রচিত কয়েকটি গ্রন্থ: আমার জীবনকথা, কাশ্মীর ও তিব্বতে, পুনর্জন্মবাদ, বেদান্তবাণী, ব্রহ্মবিজ্ঞান, মরণের পারে, যোগশিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম, হিন্দু ধর্মে নারীর স্থান, শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র রত্নাকর ইত্যাদি। কালীপ্রসাদ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকাতে এন্ট্রান্স ক্লাশ অবধি পড়াশোনা করিয়া আধ্যাত্মিক প্রেরণায় লেখাপড়া ত্যাগ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই হিন্দু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং প্রকৃত গুরুর সন্ধান করিতে থাকেন। ১৮৮৪ সালের মাঝামাঝি এক বন্ধুর পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ সকাশে যান। ইহার পর কালীপ্রসাদ বহুবার রামকৃষ্ণ সংস্পর্শে আসেন। নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী যোগচর্চা, ধ্যানধারণা প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং ঠাকুরের শেষদিন পর্যন্ত সেবা করেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যে সকল ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং কঠোরতার সহিত ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক পঠন-পাঠনে নিমগ্ন থাকিতেন। গুরুভ্রাতাগণের নিকট তিনি ছিলেন 'কালী তপস্বী'। কালীপ্রসাদ ভারতের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র পদব্রজে পরিদর্শন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের Christo-Theosophical Society-তে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি আমেরিকায় 'বেদান্ত সোসাইটি' স্থাপন করেন এবং ১৯২১ সাল পর্যন্ত সেখানে বেদান্ত প্রচার করিতে থাকেন। এইসময় তিনি পাশ্চাত্যের বহুদেশে যান এবং বহু খ্যাতিমান লোকের সহিত মতবিনিময় করেন। প্রেততত্ত্ববিদ হিসাবেও তিনি বিদেশে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি' স্থাপন করেন। এই 'সোসাইটি'র মাধ্যমে এবং তাঁহার প্রকাশিত "বিশ্ববাণী" পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও ভাবদারাকে দিকে দিকে প্রচার করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দার্জিলিঙ-এ 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ সালে ঠাকুরের জন্মশতবার্শিকী উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে আয়োজিত ধর্মসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতার বেদান্ত আশ্রমে তাঁর দেহান্ত হয়।

কালীকিঙ্কর -- ইনি একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। অচলানন্দের প্রসঙ্গে (৯-৯-৮৩) শ্রীশ্রীঠাকুর ইঁহাদের সাধনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কালীকৃষ্ণ -- ভবনাথের বন্ধু। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসব দিবসে গান গাহিয়াছিলেন (১১-৩-৮৩)।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য -- কথামৃত-প্রণেতা মাস্টারমশাই -- মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধু। বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৮২-তে দক্ষিণেশ্বরে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহাকে শুঁড়ির দোকান দেখাইবার অছিলায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে হাজির করেন এবং ঠাকুরকে বন্ধুটির বিষয়ে উপরোক্ত ঘটনা জানান। ঠাকুর সহাস্যে কালীকৃষ্ণকে ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের সুরার বিষয়ে কিছু উপদেশ দেন। কালীকৃষ্ণের সেইদিন ঠাকুরের মুখে একটি গান শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

কালীপদ ঘোষ (১৮৪৯ - ১৯০৫) -- 'দানা-কালী' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীশিষ্য। উত্তর কলিকাতার শ্যামপুকুরে প্রসিদ্ধ ঘোষ কোম্পানীতে চাকুরী করিতেন। প্রথম দর্শন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে। ন্যাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। ভক্তগণ ইঁহাদের দুইজনকে একত্রে জগাই মাধাই বলিতেন। তিনি বহু গান লিখিয়াছিলেন যাহা "রামকৃষ্ণ সঙ্গীত" নামে প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে 'দানা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ভাগ্যবান কালীপদর জিহ্বায় ঠাকুর "কালী" নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তঁহাকে বিশেষ কৃপাদান করেন। সেইদিনই অযাচিতভাবে কালীপদর

শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঠাকুর প্রথম শুভাগমন করিয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন। কালীপদর বাড়িতে ঠাকুর আরও কয়েকবার শুভাগমন করেন এবং কাশীপুরে "কল্পতরু" হওয়ার দিনেও কালীপদর বক্ষঃস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন। সুগায়ক, বেহালা ও বংশীবাদক কালীপদর বাঁশী শুনিয়া একদা ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বোম্বাইতে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ তাঁহার গৃহে অতিথি হইতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত কালীপদ ঘোষ কলিকাতাতেই দেহত্যাগ করেন।

'কিরণ্ময়ী' লেখক -- রাজকৃষ্ণ রায়, নরেন্দ্রনাথের বন্ধু। শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন।

কিশোরী (১৮৫৯ - ১৯৩১) -- [কিশোরীমোহন গুপ্ত] শ্রীম'র ছোট ভাই, কলিকাতায় জন্ম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরে (১৮৮২-৮৩)। বাসস্থান ১৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের সেবা করিতেন। সুগায়ক এবং সুকণ্ঠের অধিকারী। ঠাকুরের সম্মুখে গান করিতেন। ঠাকুরও তাঁহার গান পছন্দ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কলিকাতাস্থ দর্জিপাড়ার ডাক্তার বিশ্বনাথ গুপ্তের কন্যা রাধারাণীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিশোরী আজীবন ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি একাকী কলিকাতার বাড়িতে বাস করিতেন এবং তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। সেইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

কুইন [মহারানী ভিক্টোরিয়া] (১৮১৯-১৯০১) -- ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এড্ওয়ার্ড ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুত্র ডিউক অব কেন্ট নামে পরিচিত এবং মাতা স্যাকস্ কোবার্গের ডিউক তনয়া মেরিয়া লুইসা। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুন "গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রানী" উপাধি লইয়া তিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া গ্রেট ব্রিটেন ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। এই সময় ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে। শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃত উন্নতি হওয়ায় ১৮৮০-র দশক ইতিহাস ও সাহিত্যে 'ভিক্টোরিয়ান যুগ' নামে অভিহিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণানুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতে শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বীর হস্তে হস্তান্তরিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া 'ভারতসম্রাজ্ঞী' উপাধিতে ভূষিত হন। কেশবচন্দ্র সেন মহারানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সমাদর লাভ করেন -- শ্রীশ্রীঠাকুর কথামৃতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

কুক সাহেব [রেভারেণ্ড জোসেফ কুক] (১৮৩৮ - ১৯০১) -- আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকায় যে উদারপন্থী ধর্মমত প্রচলিত ছিল তিনি সেই ধর্মমতের প্রচারক। তিনি ইয়েল, হারভার্ড এবং জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কর্মসূত্রে অধ্যাপক ছিলেন। বাগ্মী হিসাবেও পরিচিত। 'ওরিয়েন্ট' নামক পুস্তক প্রণেতা। তিনি 'ট্রিমন্ট টেম্পল' (Tremont Temple) এবং 'ওল্ড সাউথ মিটিং হাউস' (Old South Meeting House) এ দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল যে বক্তৃতা দেন তা পরবর্তী কালে Monday Lectures নামে ১১ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরিচয় ঘটে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা ভ্রমণকালে যে সমস্ত ব্যক্তিদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন জোসেফ কুক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। একমাত্র জোসেফ কুকুই স্বামীজীর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ করেন। কিন্তু তঁহারা পরস্পর কেহই কাহাকেও একথা বলেন নাই। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জোসেফ কুক প্রাচ্য পরিভ্রমণে আসেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় ক্রমশঃ হৃদ্যতায় পরিণত হয়। কেশবচন্দ্র স্টীমারে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঠাকুরকে

দর্শন করিতে আসার সময় রেভারেণ্ড কুক এবং আমেরিকার পাদ্রী মিস পিগটকে সঙ্গে লিয়া আসেন। সেদিন ঠাকুরকে স্টীমারে লিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার সময় কুকসাহেবও উপস্থিত ছিলেন। কুকসাহেব সেখানে ঠাকুরের ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গের এবং তাঁহার সমাধিস্থ হওয়ার স্বর্গীয় দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন। খ্রীষ্টমতাবলম্বী যুবক জোসেফ কুকের কাছে এই মহাপুরুষের সমাধি দর্শন অভাবনীয় ছিল। রেভারেণ্ড কুক ইহাতে যারপরনাই অভিভূত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব অনুভূতির কথা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকাতে লিপিবদ্ধ আছে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় কুকসাহেবের বক্তৃতার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে লেডি ম্যাকবেথের জঘন্য পাপ ক্ষালন একমাত্র খ্রীষ্ট ধর্মেই সম্ভব -- এই কথার উত্তরস্বরূপ স্বামিজীর বিখ্যাত উক্তি: -- "Ye are the children of God .... Sinners! It is a sin to call a man so."

কুঞ্জবাবু -- ইনি একজন সৌখীন অভিনেতা ছিলেন। 'নববৃন্দাবন' নাটকে ঠাকুর ইঁহার পাপপুরুষের অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং পাপের অভিনয় করা ভাল নয় -- ইহাও মন্তব্য করিয়াছিলেন।

কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ (কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ) -- ইনি কুচবিহার-রাজপরিবারের সন্তান। কেশবচন্দ্র সেনের জামাতা কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের আত্মীয়। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতিয়া কন্যা সাবিত্রী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে নৃপেন্দ্রনারায়ণের জাহাজে করিয়া তিনি কেশবচন্দ্র এবং তঁহার সঙ্গীদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করেন। তাঁহার সাহেবী পোষাক শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কুমার সিং (কুঁয়ার সিং) -- শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী নানকপন্থী শিখভক্ত। দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির উত্তর পাশে সরকারী বারুদখানায় শিখসৈন্যগণের হাবিলদার ছিলেন। কুঁয়ার সিং শ্রীরামকৃষ্ণকে 'গুরু নানাক' জ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং প্রায়ই ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করিতে আসিতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কুঁয়ার সিং সাধুভোজন করাইবার সময় ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিতেন, ঠাকুরও সানন্দে তাহা স্বীকার করিতেন।

কৃষ্ণকিশোর (কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য) -- ইনি আড়িয়াদেহ নিবাসী সদাচারনিষ্ঠ রামভক্ত সাধক ও শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহীভক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তঁহার বাড়িতে অধ্যাত্মনারায়ণ পাঠ শুনিতে যাইতেন। তাঁহার "রামনাম ও শিবনামে" গভীর বিশ্বাস ছিল। বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোকে কাতর হইলেও তাঁহার ভগবৎ বিশ্বাস অটুট ছিল।

কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮ - ১৮৮৪) -- 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক, খ্যাতনামা বাগ্মী এবং রাজনীতিবিদ। জন্ম কলিকতার কাঁসারীপাড়ায়। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল। কৃষ্ণদাস দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণধন -- ইনি একজন রসিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বলরাম-মন্দিরে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিলে ঠাকুর ইঁহাকে রসিকতা ছাড়িয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন।

কৃষ্ণময়ী (কৃষ্ণময়ী বসু) -- বলরাম বসুর বালিকা কন্যা। সাধনার সময়ে পাপপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে ডাকিতে থাকায় মা ভুবনমোহিনীরূপে দেখা দেন। তাঁহার রূপ কৃষ্ণময়ীর রূপের মতো বলিয়া ঠাকুর উল্লখ করিয়াছেন। কৃষ্ণময়ী পিতৃগৃহে বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হওয়াতে কৃষ্ণময়ীর ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়। ঠাকুর কৃষ্ণময়ীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

কেদার (কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়) -- ঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীশিষ্য। হালিশহর বাসী কেদারনাথের আদি নিবাস ঢাকায়। তিনি ঢাকাতে সরকারী অফিসে অ্যাকাউটেন্টের কাজ করিতেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। কেদারনাথ প্রথমজীবনে ব্রাহ্মসমাজ, কর্তাভজা, নবসরিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হন। ঢাকায় থাকাকালে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে তঁহার আলোচলা হইত। কর্মস্থল ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতেন। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সহিত কেদারনাথের নানাবিষয়ে তর্ক বাধাইয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন।

কেশব কীর্তনীয়া -- ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত ইঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এইদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কীর্তন শুনাইয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮ - ১৮৮৪) -- কলিকাতার কলুটোলায় সেনবংশে জন্ম। পিতা প্যারীমোহন সেন। মাতা সারদাসুন্দরী দেবী। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষাগ্রহণ, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের নেতা এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। কেশবচন্দ্র সেন প্রণিত গ্রন্থ -- সত্যবিশ্বাস, জীবনবেদ, সাধু-সমাগম, দৈনিক প্রার্থনা, মাঘোৎসব, ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্র সেন, নবসংহিতা ইত্যাদি। 'পরমহংসের উক্তি' নামক গ্রন্থের সংকলক। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহধন্য। কেশব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিখ্যাত উক্তি: একমাত্র কেশবেরই ফাতনা ডুবিয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়গোপাল সেনের বাগান বাড়িতে। এই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতার সূচনা। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকাতে তিনি প্রথম ঠাকুরের কথা প্রকাশ করেন। ইহাই জনসাধারণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে প্রথম প্রচার। কেশবের "কমল-কুটীর" নামক বাটীতে (বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌টিটিউশন) ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ফোটো তোলা হয়। অত্যধিক পরিশ্রমে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঠাকুর তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ঠাকুর মর্মাহত হইয়াছিলেন।

কেশব সেনের মা [শ্রীমতি সারদাসুন্দরী দেবী (সেন)] -- ১৮০৯ সালে গরিফায় জন্ম। বাসস্থান কলিকাতার কলুটোলায়, ১৮৮৩ সালে সারকুলার রোডে অবস্থিত "কমল-কুটীর"-এ (বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন) ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। কেশবের মৃত্যুর শোকাতুরা সারদাসুন্দরীকে ঠাকুর নানা উপদেশ দানে এবং সঙ্গীতাদিতে সান্ত্বনা দিতেন। সারদাসুন্দরী দেবী ঠাকুরকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং ঠাকুরও তাঁর ভক্তির প্রশংসা করিতেন।

কোন্নগরের গায়ক -- হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী জনৈক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে নানাপ্রকার কালোয়াতি গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদ (ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র) -- শ্রীরামকৃষ্ণের বালক ভক্ত। কথামৃত প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছাত্র। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী সুবোধানন্দের সহপাঠী। ক্ষীরোদ সম্পর্কে ঠাকুর খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ক্ষীরোদের প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি মাস্টারমশাইকে নির্দেশও দিতেন। ক্ষীরোদ বরাবরই ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন কাশীপুরে অবস্থান করেন সেই সময়ও ক্ষীরোদ ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করিতেন।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় (১৭৭৫ - ১৮৪৩) -- ইনি শ্রীযুক্ত মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র; এবং

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা। বাসস্থান দেরে গ্রাম। ক্ষুদিরামের স্ত্রী চন্দ্রমণি দেবী। ক্ষুদিরাম অতিশয় ধর্মপরায়ণ, নির্ভীক, সত্যপ্রিয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত অর্থকারী কোনরূপ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা, ত্যাগ প্রভৃতি যে গুণসমূহ সদ্‌ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া কর্তব্য বলিয়া কথিত আছে, তিনি ওই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি তাঁহাতে বিশেষ প্রকাশ ছিল এবং তিনি নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া প্রতিদিন পুষ্পচয়নপূর্বক রঘুবীরের পূজান্তে জলগ্রহণ করিতেন। নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করিত। কথিত আছে যে, সত্যনিষ্ঠার জন্য প্রজাপীড়ক জমিদার ক্ষুদিরামকে সর্বস্বান্ত করিয়া স্বগ্রাম হইতে বিতাড়িত করেন। সত্যরক্ষার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই অত্যাচার অবিচার ক্ষুদিরাম স্বীকার করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মের পূর্বে ১২৮১ সালে, গয়াক্ষেত্রে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদানের পরে ক্ষুদিরাম নবদূর্বাদল শ্যাম জ্যোতির্ময়তনু এক পুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করেন এবং পুত্ররূপে ক্ষুদিরামের গৃহে তাঁহার জন্মগ্রহণপূর্বক তাঁহার সেবা গ্রহণ করার কথা জানিতে পারেন। ক্ষুদিরামের জীবনের বহু ঘটনায় তাঁহার গভীর ধর্মবিশ্বাস ও ভগবৎ পরিচয় পাওয়া যায়। একবার অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্ররূপে তাঁহাকে দেখা দেন এবং তাঁহার সেবাগ্রহণের অভিলাষ জানান। স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষুদিরাম 'রঘুবীর' শালগ্রামশিলা লাভ করেন এবং গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিত্যপূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ক্ষুদিরামের হৃদয়ে শান্তি, সন্তোষ ও ঈশ্বর নির্ভরতা নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাঁহার সৌম্য শান্ত মুখদর্শনে গ্রামবাসীরা ঋষির ন্যায় তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে থাকেন। তাঁহার দেবভক্তি এত গভীর ছিল যে একবার তিনি বহুদূর পথ অতিক্রম করার পর অসময়ে নূতন বিল্বপত্র দর্শনে গন্তব্যস্থলে যাওয়া স্থগিত রাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিল্বপত্র দিয়া শিবপূজা করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। বালক গদাধর যখন সাতবৎসরের তখন বিজয়া দশমীর দিন ক্ষুদিরাম দেহত্যাগ করেন। পরিণত বয়সেও ঠাকুর ভক্তদের নিকট মাঝে মাঝে পিতা ক্ষুদিরামের ধর্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিতেন।

খড়দহের নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামী -- স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শনকালে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। ঠাকুর তঁহার সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইনি খুব বড় পণ্ডিত এবং ইঁহার পিতাও বড় ভক্ত ছিলেন। পিতা শ্যামসুন্দরের প্রসাদ দিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন।

খেলাৎচন্দ্র ঘোষ (রামখেলাৎ ঘোষ) -- জন্ম কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায়। বিশিষ্ট দানশীল জমিদার। দীর্ঘদিন কলিকতার অবৈতনিক বিচারক, জাস্টিস অফ দি পিস এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কলিকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে তাঁর নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধীর আমন্ত্রণে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই ঠাকুর কয়েকজন ভক্তসহ খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে পদার্পণ করেন এবং ভগবৎ প্রসঙ্গ করেন।

গঙ্গাধর [গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়] (৩০।৯।১৮৬৪ -- ৭।২।১৯৩৭) -- গঙ্গাধরের জন্ম কলিকতার আহিরীটোলায়। পিতা শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। গঙ্গাধর পরবর্তী-জীবনে স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সুপরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগীশিষ্যদের অনত্যম। সম্ভবত ১৮৭৭ খ্রী: বাগবাজারে দীননাথ বসুর গৃহে তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। সঙ্গে বাল্যবন্ধু হরিনাথ ছিলেন। এই হরিনাথ পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে রিচিত। ইহার পরে ১৮৮২ অথবা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে' এবং 'স্মৃতিকথা' উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লেখা সজীব, সতেজ ও সাবলীল। ১৯২৫ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-অধ্যক্ষ এবং ১৯৩৪ সালে অধ্যক্ষ রূপে গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ (গঙ্গাপ্রসাদ সেন) (১২৩১ - ১৩০২ বঙ্গাব্দ) -- ঢাকা জেলার উত্তরপাড় কোমরপুকুর গ্রামে গঙ্গাপ্রসাদ সেনের জন্ম। পিতার নাম নীলাম্বর সেন। পিতার নিকট আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১২৪৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতার কুমারটুলীতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তৎকালীন ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবও তাঁহার চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ইনি প্রায় পঞ্চাস বৎসরের উপর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করিয়া বাংলাদেশে কবিরাজী চিকিৎসার ধারা প্রচলন করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি প্রথম দেখিতে আসেন। দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রথম অবস্থায় রানীরাসমণির জামাতা মথুরবাবুর আহ্বানে ইনি ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের আয়ত্তের বাহিরে ঠাকুরের অলৌকিক লক্ষণগুলি নিরাময় করিতে ব্যর্থ হইয়া ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদের মত অনুযায়ী এই ব্যাধিকে 'যোগজ ব্যাধি' বলিয়া অভিহিত করেন। অন্য সময়ে গঙ্গাপ্রসাদ ঠাকুরের রক্ত আমাশয় রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাপ্রসাদের বাড়িতেও ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল। পরবর্তীকালে, ঠাকুর যখন কঠিন কণ্ঠরোগে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভক্তদের প্রচেষ্টায় পুনরায় গঙ্গাপ্রসাদকে ঠাকুরের চিকিৎসা করিবার জন্য আনা হয়। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ অন্যান্য অভিজ্ঞ কবিরাজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জানিতে পারেন যে, রোগটি দুরারোগ্য, সারিবার নহে।

গঙ্গামায়ী -- ইনি বৃন্দাবনের নিকট বর্ষানা নামক স্থানে তপস্যা করতেন। বিশেষ উচ্চ অবস্থাসম্পন্না সাধিকা ছিলেন। সাধারণে তাঁহাকে শ্রীরাধার সঙ্গিনী ললিতা সখীর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইনি ঠাকুরকে শ্রীরাধার মত ভাবময়ী দেখিয়া তাঁহাকে 'দুলালী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর গঙ্গামায়ীর সেবাযত্নে মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে থাকিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই।

গণুর মা -- [যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস] (১৬।১।১৮৫১ -- ৪।৬।১৯২৪) -- যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগীন-মা নামে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা। পিতা প্রসন্নকুমার মিত্র। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। মেয়ের নাম গণু বলিয়া তাঁহাকে 'গণুর মা' বলা হইত। শ্রীসারদা দেবীর সঙ্গিনী, সেবিকা ও অসামান্যা সাধিকা যোগীন-মাকে মায়ের 'জয়া' বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরেরও কিছু সেবা করিয়াছিললেন। শ্রীশ্রীমায়ের পঞ্চতপা ব্রত সাধনাতেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। যোগীন-মা উচ্চস্তরের সাধিকা ছিলেন -- একাধিবার তাঁহার সমাধি হয়। যোগীন-মার অবিরাম তপশ্চর্যার বহু দৃষ্টান্ত আছে। বৃদ্ধাবয়সেও তাঁহার জপধ্যানে প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য যেন শ্রীশ্রীমা অনেক সময় তাঁহার সহিত দীক্ষার্থীদের মন্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। দীন দুঃখীদের প্রতি তঁহার গভীর মমতা ছিল। জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থানে মায়ের জনগণের সেবাদিতেও তিনি যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাঁহার ভগবৎ প্রসঙ্গাদি শ্রবণ করার সোভাগ্য হইয়াছিল। তাহার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনাকালে তিনি স্বামী সারদানন্দজীকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। স্ত্রীভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ ও ব্যবহারাদির ইতিহাস তাঁহার স্মৃতিশক্তিবলে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল -- প্রয়োজনস্থলে হুবুহু পুনরুজ্জীবিত হইত।

গণেশ উকিল -- মথুরবাবুদের উকিল। তাঁহাদের বিষয় সংক্রান্ত কাজ উপলক্ষে আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন।

গিরিধারি দাস -- গরাণহাটার (নিমতলা স্ট্রীট) বৈষ্ণব সাধুদের আখড়ার মোহন্ত। ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করিতে ঠাকুর এই আখড়ায় আসিয়াছিলেন।

গিরিশ [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] (২৮.২.১৮৪৪ -- ১৮.২.১৯১২) -- ইনি বঙ্গসমাজে প্রধানতঃ মহাকবি, নাট্যকার ও নট বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে তিনি একনিষ্ঠ ভক্তি ও বিশ্বাসের মূর্তি এবং ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার অপূর্ব নিদর্শন। কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাল্যাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন। প্রথমে পাঠশালায়, পরে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। বাল্যকাল হইতে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পঠনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি গড়িয়া ওঠে। পরবর্তী কালে নিজের অদ্যবসায় ও নিষ্ঠার গুণে প্রখ্যাত নট, নাট্যকার ও কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং "মহাকবি" উপাধি অর্জন করেন। তিনি দেশপ্রেমিক এবং সমাজসংস্কারক ছিলেন। বাংলা নাট্য আন্দোলনের পুরোধা গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেন। সারা জীবনে প্রায় ৮০টি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক রচনা করেন। ইহার মধ্যে উল্লখযোগ্য চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, দক্ষযজ্ঞ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, পাণ্ডবগৌরব, জনা, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্র দীননাথ বসুর গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। প্রথমে তিনি কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে দেখিতে যান। একজন বিপথগামী ব্যক্তি সাধুলোকের সংস্পর্শে আসিয়া কিভাবে পবিত্র হইতে পারে -- গিরিশচন্দ্র তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। ঠাকুরের অত্যধিক স্নেহ, অশেষ কৃপা এবং সুমধুর প্রশ্রয় তাঁহার ক্লেদাক্ত জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরাইয়া দিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'ভৈরব' আখ্যা দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল এবং তিনি যে জীবের মুক্তিকল্পে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন একথা প্রচার করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার রচিত 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখিয়া ভাবাবিষ্ট হন এবং শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনেত্রী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন। ইহা ছাড়া গিরিশের অন্য কয়েকটি নাটকও তিনি দেখেন। জীবনের অন্তিম পর্বে গিরিশ সর্বদা ঠাকুরের নাম গুণকীর্তন করিতেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের চৌম্বকস্পর্শে সকলেই অভিভূত হইয়া যাইতেন। গিরিশের জীবন বুঝিতে গেলে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দেওয়া চলে না, শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা বুঝিতে হইলে গিরিশের জীবনও তেমনি অপরিহার্য।

গিরীন্দ্র (গিরীন্দ্রনাথ মিত্র) -- কলিকাতা সিমুলিয়াবাসী গিরীন্দ্র মিত্র শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভ্রাতা। ১৮৮১ সালে ইনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণকে শঙ্কর, বুদ্ধ এবং চৈতন্যদেবের সমকক্ষ হিসাবে অনুভব করেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মধর্মে এবং নিরাকার সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। গিরীন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের সহিত বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন।

গিরীন্দ্র ঘোষ -- পাথুরিয়াঘাটায় বাড়ি। ষড়রিপু দমনের জন্য ওইগুলিকে ভগবৎমুখী করিয়া দেওয়ার কথা গিরীন্দ্র বলিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর গিরীন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গোপাল মিত্র -- রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শন করেন ১৩ই নভেম্বর ১৮৭৯। ঠাকুরের দর্শন পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রতি রবিবারে গোপাল ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন।

গোপাল সেন -- বরাহনগরবাসী ভগবৎভক্ত যুবক। ঠাকুরের সহিত প্রথম দর্শন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন এবং ঈশ্বরীয় ভাবে আবিষ্ট হইতেন। ভাবাবস্থায় ইঁহাকে ঠাকুর স্পর্শ করিয়াছিলেন। জীবনমুক্ত অবস্থায় সংসার বিষবৎ মনে হওয়ায় আত্মহত্যা করিয়া দেহত্যাগ করেন। গোপাল সেনের আত্মহত্যার সংবাদে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর দর্শন করিবার পর যদি কেউ স্বেচ্ছায়

শরীর ত্যাগ করে, তবে তাহাকে আত্মহত্যা বলে না।

গোপালের মা -- [অঘোরমণি দেবী] (১৮২২ - ১৯০৬) -- ২৪ পরগণা জেলার কামারহাটিতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম। পিতার নাম কাশীনাথ ঘোষাল। নয়-দশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। অল্প বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইবার পর কুলগুরুর দ্বারা 'গোপাল মন্ত্রে' দীক্ষিতা হন। মুণ্ডিত মস্তকে সাধিকা অবস্থায় কামারহাটি গ্রামে দত্তদের ঠাকুর বাড়িতে বাস করিতেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দীর্ঘ ৩০ বৎসর এই সাধিকা জপতপের সাহায্যে সিদ্ধা হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একদিন গভীর রাত্রে জপের সময় অঘোরমণি সহসা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান এবং তাঁহার হাতটি ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই তঁহার স্থানে গোপালের ন্যায় বালক মূর্তি দর্শন করেন। ইহার পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে বহুবার আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিনি ঠাকুরের মধ্যে গোপালের মূর্তি দর্শন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহাকে যশোদাজ্ঞানে সম্মান করিতেন। তখন হইতেই তিনি 'গোপালের মা' নামে অভিহিত হন। অঘোরমণি ভগিনী নিবেদিতাকে 'নরেনের মেয়ে' বলিয়া ডাকিতেন। অন্তিমাকালে নিবেদিতা তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছিলেন।

গোপী দাস -- খোল বাদক। শ্রীশ্রীঠাকুরের গানের সঙ্গে সংকীর্তনে খোল বাজাইয়াছিলেন।

গোবিন্দ চাটুয্যে -- ঠাকুর প্রথম কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে ইঁহাদের বাড়িতে ছিলেন।

গোবিন্দ পাল -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বরাহনগর নিবাসী তরুণ ভক্ত। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৬৪-তে, দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ইনি ভগবৎ ভক্ত ছিলেন এবং অল্প বয়সে দেহরক্ষা করেন।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য পরমভক্ত। ইনি চব্বিশ পরগণা জেলার বেলঘরিয়ার অধিবাসী। দেওয়ানের পদে নিযুক্ত এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তিমান গোবিন্দ ঠাকুরের প্রতি অতীব আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর তাঁহার বেলঘরিয়ার বাড়িতে শুভাগমন করেন এবং সংকীর্তনে নৃত্য করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কীর্তনের সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ রায় -- সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত গোবিন্দ রায় আরবী, পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। নানাধর্মের বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি অবশেষে ইসলাম ধর্মের উদার মতবাদে আকৃষ্ট হন এবং তাহাতেই আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কোরাণ পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহিত ধর্মচর্চা করিয়া সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর নিকট সাধনার স্থান নির্বাচন করেন। সেই সময় ঠাকুর তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা এবং ভগবৎপ্রেমে আকৃষ্ট হন। তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিয়া তিনি মোহিত হন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইসলাম ধর্ম সাধন করিয়া মহম্মদের দর্শন লাভ করেন।

গোষ্ঠ -- খোলবাদক। ইঁহার বাহনা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের রোমাঞ্চ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রের বাড়িতে তিনি খোল বাজাইয়াছিলেন।

গৌরী পণ্ডিত (গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য) -- বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামের বাসিন্দা। বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক, তাঁহার কিছু সিদ্ধাই ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মথুরবাবু দক্ষিণেশ্বরে একটি সভা আহ্বান করেন। এই সময়ে গৌরী পণ্ডিত ঠাকুরকে অবতারগণের উৎসস্থল বলিয়া ঘোষণা করেন (১৮৭০)। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে দিন দিন তাঁহার মন পাণ্ডিত্য, লোকমান্য, সিদ্ধাই প্রভৃতি সকল বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম অভিমুখী হইতে থাকে। গৌরী দিন দিন ঠাকুরের ভাবে মোহিত হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগী হইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য হয়। একদা তিনি সজল নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহন করিয়া চিরতরে গৃহত্যাগ করেন। বহু অনুসন্ধানেও ইহার পর গৌরী পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই।

গৌরী মা (১৮৫৭ - ১৯৩৮) -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা স্ত্রীভক্ত। প্রকৃত নাম মৃড়ানী বা রুদ্রাণী। পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। মাতা গিরিবালা দেবী। তঁহার পিতৃগৃহ ছিল হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে। কিন্তু তিনি মাতুলালয় ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে 'সন্ন্যাস' গ্রহণের পর মৃড়ানীর নাম "গৌরীপুরী" হওয়ায় ভক্তসমাজে তিনি 'গৌরী-মা' নামে পরিচিতা হন। কিন্তু ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তিনি ছিলেন 'গৌর দাসী'। গৌরী-মার ব্যক্তিত্ব ছিল অতুলনীয়। তাঁহার একনিষ্ঠতা, সাহস এবং শক্তি সকলের শ্রদ্ধার যোগ্য বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়েরা তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করায় তিনি ইহাতে প্রবল আপত্তি জানান এবং বিবাহের রাত্রে বাড়ি হইতে পলায়ন করেন। অতঃপর তিনি গলায় দামোদর শিলা লইয়া পাগলিনীর ন্যায় দীর্ঘ উনিশ বৎসর নানাতীর্থস্থানে ঘুরিয়া তপস্যা করিতে থাকেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ কালে হরিদ্বারের পথে একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর সহিত মিলিত হন, এই সাধুসঙ্গেই তিনি "গৌরী-মায়ী" নামে অভিহিতা হন। ১৮৮২ সালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া গৌরী-মা অভিভূত হন। পরম ভাগ্যবতী গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের এবং সেবার অধিকারী হন। কিছুকাল তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গেও বাস করেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর এ দেশের মায়েদের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া গৌরী-মাকে তাহাদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের কথা বলেন। পরবর্তী কালে গৌরী-মা মাতাঠাকুরানীর অনুমতিক্রমে প্রথমে বারাকপুরে গঙ্গাতীরে পরে বাগবাজারে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গৌরী-মার গান শুনিয়া ঠাকুরের সমাধি হইত। ঠাকুর তাঁহাকে মহাতপস্বিনী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। অপরপক্ষে গৌরী-মাও ঠাকুরকে অবতার রূপে ও মাতাঠাকুরানীকে ভগবতীরূপে ভক্তি করিতেন।

চন্দ্র চাটুজ্যে (চন্দ্র চ্যাটার্জী) -- ঠাকুরের তন্ত্রসাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণির নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইজন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভ্রাতা রূপে পরিচিত। ভৈরবীর সহায়তায় চন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। তিনি উচ্চদরের সাধক ছিলেন। কিন্তু বিশেষ সিদ্ধাইলাভের ফলে সাধনপথ হইতে ভ্রষ্ট হন। পরে ঠাকুরের পূত সান্নিধ্যে তাঁহার সিদ্ধাইশক্তি নষ্ট হয় এবং ঠাকুরের দিব্যশক্তির প্রভাবে তিনি সঠিক পথে অগ্রসর হন। চন্দ্র ঠাকুরের অনুগত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ঠাকুর চন্দ্রকে ঘনিষ্ঠ ঈশ্বর প্রেমী বলিয়া বর্ণনা করিতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার দীর্ঘকাল পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্র অকস্মাৎ বেলুড়মঠে উপস্থিত হন এবং মাসাধিককাল সেখানে বাস করেন। তিনি নিত্য জপ-ধ্যানে নিরত থাকিতেন।

চন্দ্র হালদার -- কালীঘাটের হালদার বংশীয়, মথুরবাবুদের পুরোহিত। মথুরবাবুর উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব এবং মথুরবাবুর ঠাকুরের উপর প্রশয়পূর্ণ ব্যবহার ও পক্ষপাতিত্বের জন্য ঠাকুরের প্রতি সে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিল। সে ধূর্ত ও খল প্রকৃতির ছিল। ঠাকুরের ভাবাবিষ্ট অবস্থাকে এবং সরলতাকে ধূর্ততার ভান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। নানা মিথ্যা কথা বলিয়া মথুরবাবুর আস্থাভঞ্জন হইবার চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হয়। একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর যখন ভাবসমাধির ফলে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মথুরবাবুর জানবাজারের বাড়িতে

পড়িয়া আছেন, তখন সে তাঁহাকে পদাঘাত করে এবং অত্যন্ত কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার কঠোর শাস্তি বিধানের আশঙ্কায় ঠাকুর এই ঘটনা মধুরবাবুর কর্ণগোচর করেন নাই। পরে অন্য কোন অপরাধের ফলে চন্দ্র হালদার কর্মচ্যুত হইলে ঠাকুর মথুরবাবুর নিকট ওই ঘটনার উল্লেখ করেন।

চন্দ্রমণি (চন্দ্রমণিদেবী) (১৭৯১ - ১৮৭৬ খ্রী:) -- ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভাগ্যবতী জননী। চন্দ্রমণিদেবীর জন্ম সরাটি মায়াপুর গ্রামে। তাঁহার সরলতা, দেবদ্বিজে ভক্তি এবং সর্বপরি সততা সকলকে মুগ্ধ করিত। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী ছিলেন স্নেহ ও সরলতার মূর্তি -- প্রতিবেশীগণ সম্পদে-বিপদে তাঁহার ন্যায় হৃদয়ের সহানুভূতি আর কোথাও পাইত না। দরিদ্ররা জানিত চন্দ্রাদেবীর নিকট তাহারা যখনই উপস্থিত হইবে, তখনই অন্নের সহিত অকৃত্রিম যত্ন ও ভালবাসায় তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে, ভিক্ষুক সাধুদের জন্য তাঁহার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত ছিল এবং প্রতিবেশী বালক-বালিকাদের সমস্ত আবদার তিনি পূর্ণ করিতেন। চন্দ্রমণি জাগ্রত অবস্থায় অথবা নিদ্রিত অবস্থায় প্রায়ই নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনা দেখিতে পাইতেন। ইহাতে তিনি কখনও কখনও অতিশয় ভীত হইতেন আবার কখনও-বা বিস্মিত হইতেন। একবার কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে তিনি মা লক্ষ্মীকে দর্শন করিয়াছিলেন। চন্দ্রমণির ৪৫ বৎসর বয়সে গদাধরের আবির্ভাবের পূর্বেও তিনি এইরূপ অলৌকিক এক জ্যোতির দর্শন পাইয়াছিলেন। গদাধর শৈশব হইতেই দেবদ্বিজে ভক্তির ভাব তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। চন্দ্রমণি দেখিয়াছিলেন বাড়ির নিকট যুগীদের মন্দিরের মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতি নির্গত হইয়া তরঙ্গাকারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। গদাধরের জন্মের পূর্বে তিনি প্রায় নিত্যই দেবদেবীসকলের দর্শনলাভ করিতেন এবং সকল দেবদেবীর উপরেই এইকালে তাঁহার মাতৃস্নেহ যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার এইকথা স্মরণ করিয়াছিলেন। শেষজীবনে প্রায় ১২ বৎসর চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়াছিলেন। প্রথমে মথুরবাবুদের কুঠিবাড়িতে এবং শেষে নহবতের দ্বিতলে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। মায়ের কথা মনে হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ীর নিকট থাকেন নাই। ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। শেষ মুহূর্তে তাঁহার দেহ গঙ্গাতীরে আনা হয় এবং ঠাকুর তাঁহার গর্ভধারিণীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করেন।

চিনে শাঁখারি (শ্রীনিবাস শাঁখারি) -- শ্রীনিবাস বা চিনু নামে অভিহিত কামারপুকুর নিবাসী ধার্মিক ব্যক্তি। চিনে শাঁখারি খুব উঁচুদরের বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। গদাধরের শৈশবেই চিনু তাঁহার দৈবী স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্বয়ং চৈতন্যদেব গদাধররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ইষ্টদেবতারূপে পূজা করিতেন ও তাঁহার বাল্যলীলার সঙ্গী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে আসিতেন তখনও তিনি তাঁহার চিনুদাদার সহিত পূর্ববর্তী সম্পর্ক বজায় রাখিতেন। চিনু দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন।

চুনীলাল [চুনীলাল বসু] (১৮৪৯ - ১৯৩৬) -- চুনীলাল বসু ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত, কলিকতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুস্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকুরী করিতেন। চুনীলাল সাধুদর্শনের ইচ্ছায় দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশমত চলিয়া ইনি যোগাভ্যাসজনিত হাঁপানি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে তিনি ঠাকুরকে অবতার বলিয়া বুঝিতে পারেন। কাশীপুরে "কল্পতরু" দিবসে তিনি ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ চুনীলালকে "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিতেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ও মঠের বিভিন্ন কাজে সাহায্যে করিতেন।

ছোট গোপাল (গোপালচন্দ্র ঘোষ) -- বাসস্থান কলিকাতার সিমলা অঞ্চল। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ

দক্ষিণেশ্বরে। মাঝে মাঝে ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছেন। ইনি হঠাৎ হঠাৎ ঠাকুরের নিকট যাইতেন বলিয়া তাঁহাকে 'হুট্‌কো' গোপাল বলা হইত। ঠাকুরের গোপাল নামক কয়েকজন ভক্ত থাকায় তাঁহাকে 'ছোট গোপাল' নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ঠাকুরের নিকট হইতে বিশেষ কৃপালাভ করেন এবং ঠাকুরকে গুরু-রূপে বরণ করেন। তিনি কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে সেবা করিয়াছিলেন। বরাহনগর মঠে তিনি সাধুদের সেবাদি করিয়াছিলেন। পরে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন এবং একটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

ছোট নরেন (নরেন্দ্রনাথ মিত্র) -- শ্যামপুকুর বাসিন্দা ও শ্রীম-র ছাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, শুদ্ধাত্মা ভক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের নাম "নরেন" হওয়ায়, ঠাকুর একই নামের এই ভক্তটিকে "ছোট নরেন" বলিতেন। ঠাকুরের প্রতি প্রবল আকর্ষণে সকল বাধা বিপদ তুচ্ছ করিয়া তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন -- এবং তাঁহাকে দেখিয়া প্রায়ই সমাধিস্থ হইতেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে ছোট নরেনেরও মাঝে মাঝে ভাব সমাধি হইত। পরবর্তী কালে ইনি হাইকোর্টের এ্যটর্নী হন -- রামকৃষ্ণ মিশনের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সাংসারিক জীবন সুখের হয় নাই।

জজ (সদরওয়ালা) -- সুরেন্দ্রের মেজোভাই। সুরেন্দ্রের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। (১৯-১১-১৮৮২)

জয়গোপাল সেন -- প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলঘরিয়ায় (৮ নং বি. টি. রোড) তাঁহার বাগানবাড়িতে কেশব সেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতার বাসা ছিল মাথা ঘষা গলিতে। সেখানেও শ্রীশ্রীঠাকুর পদার্পণ করিয়াছিলেন। জয়গোপাল সেন ঠাকুরের একান্ত অনুগত। জয়গোপালের বাড়িতে ঠাকুর প্রায়ই যাইতেন, ধর্মীয় বিষয়ে বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং ভক্তগণকে উপদেশ দিতেন। জয়গোপাল নিজেও মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। জয়গোপাল সেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন এবং ঠাকুরের ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে জয়গোপাল সেন ছিলেন অন্যতম।

জয়নারায়ণ পণ্ডিত [তর্কালঙ্কার] (১৮০৮ - ১৮৭৩) -- দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মুচাদিপুর গ্রামে জন্ম। পিতা শ্রীহরিশচন্দ্র বিদ্যাসাগর। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ অমরকোষ ও কাব্যশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়া ভবানীপুরের রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার এবং জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাশেষে হাওড়ায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১১টি। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি উদার মনোভাবাপন্ন, প্রকৃত নিরহঙ্কার এবং পরম ভক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুর স্বয়ং কলিকাতায় জয়নারায়ণকে দেখিতে যান। তিনি ইঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের কাশীতে দেহত্যাগ হয়।

জয় মুখুজ্জে (জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়) -- বরাহনগরবাসী জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বিচরণ কালে শ্রীরামকৃষ্ণ একদা বরাহনগরে গঙ্গার ঘাটে ইঁহাকে অন্যমনস্কভাবে জপ করিতে দেখিয়া দুই চাপড় মারিয়াছিলেন।

জানকীনাথ ঘোষাল (১৮০৪ - ১৯১৩) -- আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন ভক্ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জামাতা। জানকীনাথ ২রা মে ১৮৮৩ সালে নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তিনি উপাসনা মন্দিরে ঠাকুরের নিকটেই বসিয়াছিলেন। ঠাকুর সেদিন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তা রাধিকার আকুলতার উদাহরণ

দিয়াছিলেন। তাহাতে জানকীনাথ এই উন্মত্ততা অভিপ্রেত কিনা জানিতে চাহেন। ঠাকুর তখন প্রেমোন্মাদ জ্ঞানোন্মাদের মতনই ভগবৎপ্রেমেও যে উন্মাদ হওয়া যায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

জ্ঞান চৌধুরী -- সিমুলিয়া নিবাসী জ্ঞান চৌধুরী ব্রাহ্মভক্ত এবং উচ্চশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী ছিলেন। পত্নী বিয়োগের পর সাময়িকভাবে তাঁহার মনে বৈরাগ্য আসে এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে আসেন। তাঁহার একটি তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তিতে ক্ষুব্ধ হইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বিদ্যার অহংকার ত্যাগ করিয়া ভক্তিপথে থাকার নির্দেশ দেন; এবং তিনি পরবর্তী কালে ঠাকুরের নির্দেশ পালন করেন। জ্ঞান চৌধুরীর বাটীতে আয়োজিত ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং জ্ঞান চৌধুরী সেদিন ঠাকুর সহ সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

ঠাকুরদাদা (নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) -- বরাহনগরনিবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র। তিনি কথকতা অভ্যাস করিতেন। সাধারণতঃ "ঠাকুরদা" বলিয়া তিনি পরিচিত। তিনি নিয়মিত সাধন-ভজন করিতেন। ২৭/২৮ বৎসর বয়সে বরাহনগর হইতে পদব্রজে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ২৩/৩/১৮৮৪-তে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঠাকুরের কাছে সাধন-ভজন করা সত্ত্বেও মনের অশান্তির কথা জানাইলে এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় জানিতে চাহিলে ঠাকুর তাঁহাকে সকাল বিকাল হাততালি দিয়া "হরিনাম" করিতে বলেন। ঠাকুরদাদা সেইদিন ঠাকুরকে কতিপয় গান শুনাইয়া বিশেষভাবে প্রীত করেন। ইহা ছাড়া ঠাকুরের উপদেশামৃতশুনিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

ঠাকুরদাস সেন -- ব্রাহ্মভক্তদের অন্যতম। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে তিনি ধন্য হন। ঠাকুরদাস কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ছিলেন। কেশব সেন একদা যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে কেশবের মতের পরিচয় পাইয়া ঠাকুরদাস বিস্মিত হন এবং কেশবের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যান।

তারক [তারকনাথ ঘোষাল, পরে স্বামী শিবানন্দ] (১৮৫৪ - ১৯৩৪) -- তারকনাথের আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার বারাসত গ্রামে। জন্ম রানী রাসমণির কাছারী বাড়িতে। পিতা শক্তিসাধক রামকানাই ঘোষাল রানী রাসমণির মোক্তার নিযুক্ত হইয়া তাঁহারই কাছারী বাড়িতে বসবাস করিতেন। মাতা বামাসুন্দরী তারকেশ্বরের বরে পুত্র লাভ করেন। তারকনাথের ৯ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। তারকের পিতা ঘোষাল মহাশয় একদিকে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন, অপরদিকে তেমনই মুক্ত হস্তে ব্যায় করিতেন। মাতা বামাসুন্দরী খুবই ধর্মপ্রাণা ছিলেন। এই তারকনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী শিবানন্দ নামে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী সন্তানের মধ্যে শিবানন্দ অন্যতম। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। প্রথম দর্শনেই তারকনাথের মন-প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পিত হইল। ইতিমধ্যে তারকনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দর্শনে সাক্ষাৎ জননীজ্ঞানে ঠাকুরের কোলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের চোখে করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে। ক্রমে ক্রমে তারকনাথ তাঁহার নিজের স্থান বুঝিয়া নিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও করিতে কাগিলেন। তারকনাথ দেখেন আর শেখেন। একসময়ে ঠাকুরের কথা টুকিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন, হঠাৎ একদিন ঠাকুর বলিলেন, "তোর ওসব কিছু করতে হবে না -- তোদের জীবন আলাদা।" সেদিন হইতে এই সঙ্কল্প বিদায় দিলেন। শিবানন্দ বাণী, শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা, মহাপুরুষজীর পত্রাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে স্বামী শিবানন্দের বানী সঙ্কলিত হইয়াছে।

তারক (তারক মুখার্জী) -- বেলঘরিয়ার অধিবাসী। শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত ভক্ত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের

অশেষ কৃপালাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর বেলঘোরের তারককে মৃগেল বলা যায়।" কথাপ্রসঙ্গে একদিন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর তাঁহার নিজের ভিতর হইতে এক উজ্জ্বল আলোক শিখা নির্গত হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে তারকের অনুসরণ করিতেছে এ কথা মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। তিনি তারককে কামিনী-কাঞ্চন হইতে সাবধান থাকিতে বলেন এবং তাঁহার নিকট আসিলে তাহার সাধনার বাধা শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। কয়েকদিন পরে তারক আসিলে তিনি সমাধিস্থ হইয়া তাহার বক্ষে শ্রীচরণ স্থাপন করেন। ঠাকুর তাহাকে বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর সাধনার জন্য বাপ-মার আদেশ লঙ্ঘনে কোন দোষ নাই।

তারাপদ -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। বলরাম বসুর গৃহে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ভক্তদের সহিত তিনি ঠাকুরের দর্শনলাভে ধন্য হন। সেই সময়ে গায়ক হিসাবে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহার গান শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারাপদ গিরিশ ঘোষের "কেশব কুরু করুণা দীনে" গানটি শুনাইলে ঠাকুর সন্তুষ্ট হন এবং ঠাকুরের অনুরোধে তিনি আরও কতকগুলি ভজন ও কীর্তন গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।

তুলসী [শ্রীতুলসীচরণ দত্ত] (১৮৬৩ - ১৯৩৮) -- শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরাগী বালক ভক্ত -- বাগবাজার লেনে দত্ত পরিবারে জন্ম। তাঁহার বাল্যবন্ধু স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্যলকাটা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিছুকাল কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৭/১৮ বৎসর বয়সে বলরাম বসুর গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি প্রথম দর্শন করেন। তখন হইতে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি বরাহনগর মঠে যোগ দেন এবং পরবর্তী কালে স্বামী নির্মলানন্দ রূপে পরিচিত হন।

তুলসীরাম [তুলসীরাম ঘোষ] (১২৬৫ - ১৩৫২ বঙ্গাব্দ) -- আঁটপুর নিবাসী তুলসীরাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত বাবুরাম মহারাজ তথা স্বামী প্রেমানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বলরাম বসুর শ্যালক। তুলসীরাম তাঁহার ভগ্নীপতি ঠাকুরের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর সহয়তায় ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহর ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ যখন প্রথম জীবনে সাধুর অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তখন তুলসীরামই তাঁহাকে ঠাকুরের সন্ধান দেন।

তেজচন্দ্র [তেজচন্দ্র মিত্র] (১৮৬৩-১৯১২) -- ঠাকুরের একজন গৃহীভক্ত। বাগবাজার বোসপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা, শ্রীম-র ছাত্র। বাল্যকালেই শ্রীম-র অনুপ্রেরণায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়েরও কৃপাধন্য ছিলেন। তিনি নিয়মিত ধ্যান করিতেন ও মিতভাষী ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'শুদ্ধ আধার' জ্ঞান করিতেন এবং আপনার লোক বলিয়া অতিশয় স্নেহ করিতেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী (আনুমানিক ১৬০৭ - ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) -- ভারতবিখ্যাত যোগী মহাপুরুষ। অন্ধ্রপ্রদেশের এক ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। পূর্বনাম শিবরাম রাও। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাশীতে অতিবাহিত করেন। লোকে তাঁহাকে শিবাবতার বলিত। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। ১৮৬৮ সালে তীর্থভ্রমণকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় তিনি মৌন অবস্থায় ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত ইঙ্গিতে তাঁহার ঈশ্বরবিষয়ক কথাবার্তা হয়। ঠাকুর হৃদয়কে তাঁহার 'পরমহংস' অবস্থার কথা বলিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল (১৮৪০ - ১৯১৬) -- ব্রাহ্মভক্ত, কেশব সেনের অনুগামী। গীতিকার ও সুগায়ক। বলা যায় কেশব সেনের সংস্পর্শে আসিয়াই ত্রৈলোক্যের নবজন্ম ঘটে। বাল্যকাল হইতেই তিনি গান গাহিতেন। কিন্তু

সঙ্গীত এবং পুঁথিগত বিদ্যার বিধিবদ্ধ শিক্ষা তাঁহার কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে বসবাসকালে হয়। কেশবচন্দ্রের সঙ্গী হিসাবে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ঘটে। দক্ষিণেশ্বরে বহুবার তিনি যান এবং সেখানে মধুর সুললিত কণ্ঠে ঠাকুরকে সঙ্গীত শুনাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহার রচিত সঙ্গীত ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং ঠাকুর স্বয়ং বিশেষ ভাবোদ্দীপক গানগুলি করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি কেশবচন্দ্র কর্তৃক 'চিরঞ্জীব শর্মা' উপাধি পান এবং নিজে 'প্রেমদাস' নাম গ্রহণ করেন। এই দুই ছদ্ম নামে তিনি সহস্রাধিক ভক্তিসঙ্গীত ও কীর্তন রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'নব বৃন্দাবন' নাটকে নরেন্দ্রনাথ 'পাহাড়ী বাবার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ঠাকুর এই নাটক দেখিয়াছিলেন এবং ত্রৈলোক্যের প্রণীত গ্রন্থ 'ভক্তিচৈতন্য চনিদ্রকা' পড়িতে ভক্তদের বলিয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হইল গীতরত্নাবলী, পথের সম্বল, কেশবরচিত, ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা।

ত্রৈলোক্য বিশ্বাস -- ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস ছিলেন মথুরামোহন বিশ্বাসের পুত্র এবং রাণী রাসমণির দৌহিত্র। ১৮৭১ সালে তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সেবাইতের অধিকারী হন এবং আজীবন ওই দায়িত্ব পালন করেন। ত্রৈলোক্যনাথ দায়িত্ব ভার নেওয়ার পর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই। অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি অনত্র যান।

দমদমার মাস্টার (শ্রীযজ্ঞেশ্বর চন্দ্র ঘোষ) -- দমদমার একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেন বলিয়া তিনি কথামৃতে 'দমদমার মাস্টার' বলিয়া পরিচিত। বাঁকুড়া জেলার কাটিকা গ্রামে ইঁহার বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যজ্ঞেশ্বর বরাহনগর মঠে প্রায়ই আসিতেন। তিনি সকলের বিশেষ প্রিয়ভাজন হন।

দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী (১৮২৪ - ৮৩) -- আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, পূর্বনাম মূলশঙ্কর। বেদ, বেদান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। দয়ানন্দের মতে মূল হিন্দুধর্ম বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মূর্তিপূজা বেদ-বিরোধী কার্য। তিনি ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকল ধর্মের লোকের সহিত বিচার করিতেন। কাশীতে এক শাস্ত্রীয় সম্মেলনে বিচার সভায় জয়লাভের পর তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর কলিকাতার সিঁথিতে নৈনারের (সিঁথির) ঠাকুরদের প্রমোদ কাননে ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। দয়ানন্দ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে প্রথম আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি প্রায় ১০০টি আর্যসমাজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা ও বোম্বাই ইত্যাদি স্থানে। তিনি জাতিভেদ প্রথা মানিতেন না। স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বদা স্বীকার করিতেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ'।

দারোয়ান -- যদু মল্লিকের বাগানের দারোয়ান। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় হাতপাখা লইয়া বাতাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করাইতেন।

দীন মুখুজ্জে (দীননাথ মুখার্জী) -- উত্তর কলিকতার বাগবাজার নিবাসী ভক্তিমার্গের গৃহীসাধক। দীননাথের ঈশ্বর ভক্তির কথা জানিতে পারিয়া ঠাকুর স্বেচ্ছায় একদা মথুরামোহন বিশ্বাসের সহিত দীননাথের গৃহে উপস্থিত হন। কিন্তু সেদিন দীননাথের গৃহে উপনয়ন উপলক্ষে সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ঠাকুর কাহাকেও আর ব্যতিব্যস্ত না করিয়া ফিরিয়া আসেন।

দীননাথ খাজাঞ্চী -- দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের খাজাঞ্চী (কোষাধ্যক্ষ)। ইনি কয়েকবার ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন।

দুকড়ি ডাক্তার -- শ্যামপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে গলরোগের সময় দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে সমাধিস্থ ঠাকুরের চোখে অঙ্গুলি দিয়া তিনি ঠাকুরের সমাধি পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

দুর্গাচরণ ডাক্তার -- দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুর ভক্তদের সাথে কলিকাতায় এই ডাক্তারকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। যদিও তিনি অতিমাত্রায় মদ্যপান করিতেন, তথাপি তাঁহার চিকিৎসার ব্যাপারে খুব হুঁশ থাকিত -- ইহা শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবেন্দ্র (দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ) -- শ্যামপুকুর নিবাসী দেবেন্দ্র ঠাকুরের একজন অনুরাগী ভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন এবং ঠাকুরের নিকট নানা উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

দেবেন্দ্র [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] (১৮৭১ - ১৯০৫) -- ইনি মনীষী, পরম সাধক, আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত নেতা। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার প্রচলন করেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচিন্তা করেন শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুর সহিত একদা মহর্ষির বাড়িতে তাঁহাকে দেখিতে যান। প্রথম পরিচয়েই ঠাকুর মহর্ষির ভিতর সাধকের লক্ষণ দেখিতে পান। অত জ্ঞানী এবং ঈশ্বরোপাসক হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষিকে সংসারের কাজে ব্যাপৃত দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'কলির জনক' বলেন। ইহার পর তাঁহার অনুরোধে মহর্ষি তাঁহাকে বেদ হইতে কিছু কিছু শোনান। ঠাকুরের ধ্যানাবস্থায় দর্শনের সঙ্গে ইহার মিল ছিল। মহর্ষিও ঠাকুরের সহিত ধর্মালোচনায় প্রীত হন ও তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিবার আমন্ত্রণ জানান। কথামৃতে ঠাকুর বহুবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা উল্লখ করিয়াছেন।

দেবেন্দ্র [দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার] (১৮৪৪ - ১৯১১) -- শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহীভক্ত। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার জগন্নাথপুর গ্রামে 'মজুমদার' উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রসন্ননাথ, মাতা বামাসুন্দরী দেবী। প্রথম জীবন তাঁহার দারিদ্রের মধ্যে অতিবাহিত হওয়ায় তিনি কলিকতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী গ্রহণ করেন। সাহিত্যে চর্চাও করেন। তিনি যোগাভ্যাস করিতেন, এই সময় বহু দেবদেবীর দর্শন হইত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। এই সময়ে পুস্তকে 'পরমহংস রামকৃষ্ণ' কথা দুইটি পড়িয়া তিনি এক মহা আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ আচরণে মুগ্ধ হন। কিন্তু সেইদিনই তিনি আকস্মিক অসুস্থতা লিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রবল জ্বরে শয্যাগত অবস্থায় তিনি শিওরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন। ইহার পর বলরাম বসুর গৃহে ঠাকুরকে পুনরায় দর্শন করিয়া তিনি তখন গৃহ হইতেই মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে কলিকাতায় নিজ গৃহে দেবেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরকে সেবা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 'সন্ন্যাস' গ্রহণের জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইলে ঠাকুর তাহাতে সম্মত হন নাই। পরবর্তী কালে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবেনদ্রনাথ সেখানে তাঁহার স্বরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভজন, কীর্তনাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন এবং এই গানগুলিই পরে 'দেবগীতি' নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার বিখ্যাত "ভব সাগর তারণ কারণ" ইত্যাদি গুরুবন্দনা ও অন্যান্য ভক্তিমূলক ভজন বহুল গীত হইয়া থাকে।

দ্বারিকানাথ (দ্বারিকানাথ বিশ্বাস) -- মথুরবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভক্ত। তিনি পিতার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ছিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। একদা দক্ষীণেশ্বরে আগত এক নেপালী ব্রহ্মচারিণীর কণ্ঠে 'গীতগোবিন্দে'র গান শুনিয়া তিনি ঠাকুরের সম্মুখেই অশ্রুমোচন করিতে থাকিলে ঠাকুর তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। একবার দ্বারিকানাথ তাঁহার মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনে আগত ব্যারিস্টার

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ঠাকুরের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

দ্বিজ (দ্বিজ সেন) -- কথামৃতকার শ্রীম-র শ্যালক। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতে দ্বিজর বাবার প্রবল আপত্তি ছিল। এ বিষয়ে ঠাকুরের সহিত পিতা আলোচনা করিতে আসিলে ঠাকুর মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বুঝান যে অধ্যাত্মগুণসম্পন্ন পুত্র হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। ঠাকুর তাঁহার নিকট দ্বিজর প্রশংসা করেন এবং দ্বিজকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য বাধা দিতে নিষেধ করেন। ঠাকুরের প্রতি দ্বিজর একান্ত অনুরাগকে তিনি পূর্ব সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের নিকট ইঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলিয়াছিলেন।

দ্বিজর পিতা (ঠাকুরচরণ সেন) -- মাস্টার মহাশয়ের শ্বশুর ঠাকুরচরণ সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি কেশবচন্দ্র সেনের জ্ঞাতিভ্রাতা। ইঁহার কন্যা শ্রীমতি নিকুঞ্জবালা দেবীর সহিত শ্রীমর বিবাহ হয়। সওদাগরী অফিসের ম্যানেজার ছিলেন।

ধনী কামারিনী -- মধুসূদন কর্মকারের কন্যা ধনীকামারিনী। উপনয়নের উপলক্ষে -- ঠাকুরের ভিক্ষামাতা এবং মাতা চন্দ্রমণির ঘনিষ্ঠ সহচরী, কামারপুকুরে লাহাবাবুদের বাড়ির নিকটে এক ক্ষুদ্র কুটীরে এই বিধবা মহিলা বাস করিতেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইবার পরমুহূর্তেই ধনীই সদ্যোজাত শিশুকে ভস্মমাখা অবস্থায় উনুনের ভিতর হইতে উঠাইয়া লইয়া এই পৃথিবীতে অবতার পুরুষের প্রথম মুখদর্শন ও প্রথম তাঁহাকে কোলে লইবার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ধনীকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। উপনয়নের সময় তিনি অন্য সকলের মতের বিরুদ্ধে ধনীর নিকট হইতে সর্বাগ্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার পূর্বাভিলাষ পূরণে স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভক্তিমতী ধাত্রীমাতা ও ভিক্ষামাতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাৎসল্যভাবে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহাকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন।

নকুড় আচার্য -- কামারপুকুর অঞ্চলের অধিবাসী। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নৃত্যসহ গানের প্রশংসা করিতেন।

নকুড় বাবাজী -- বৈষ্ণব ভক্ত, ভাল কীর্তনীয়া। কামারপুকুর গ্রামের অধিবাসী। কলকাতার ঝামাপুকুরে তাঁহার একটি দোকান ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের ঝামাপুকুরের বাসায় অবস্থানকালে মধ্যে মধ্যে নকুড়ের দোকানে গিয়া বসিতেন। দেশের লোক হিসেবে নকুড় তাঁহাকে বিশেষ আপ্যায়ন করিতেন। পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিতের বিখ্যাত চিঁড়া মহোৎসবে তিনি প্রতিবছর যোগদান করিতেন এবং কীর্তন করিতেন। ফিরিবার পথে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রতিবার সাক্ষাৎ হইত এবং তিনি পূর্ব পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

নগেন্দ্র (নগেন্দ্রনাথ মিত্র) -- সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। দক্ষিণেশ্বরে ও স্বগৃহে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬২ - ১৯৪০) -- বিহার প্রদেশের মতিহারিতে নগেন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা মথুরনাথ আরা জেলার সাবজজ ছিলেন। বাল্যেই নগেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত ছিলেন। উভয়ে একসঙ্গে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে অধ্যয়ন করিতেন। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রূপে তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহিত স্টীমবোটে সোমড়া পর্যন্ত ভ্রমণকালে (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। ঠাকুরের কথা বলার মধুর ভঙ্গি, সাধারণ কথ্য ভাষার বাস্তব উদাহরণের সহিত গভীর ধর্মতত্ত্বের কথা বলার বৈশিষ্ট্য তিনি পরম কৌতুহলের সহিত লক্ষ্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের

স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও ভক্তিপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবার ধারাও নগেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। যদিও নগেন্দ্রনাথ মাত্র একবারই ঠাকুরকে দর্শন করেন তবুও এই ঘটনাই তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি একটি প্রবন্ধে ঠাকুরের চেহারা হুবুহু বর্ণনা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নগেন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের বিবরণ শুনিয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাহার কিছুকাল পরেই মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। প্রবুদ্ধ ভারত, উদ্বোধন, মডার্ণ রিভিউ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। মডার্ণ রিভিউতে নগেন্দ্রনাথের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির বর্ণনা পড়িয়া মনীষী রোমা র‍্যোঁলা মুগ্ধ হন।

নটবর (নটবর গোস্বামী) -- হুগলী জিলার ফুলুই শ্যামবাজারের পার্শ্ববর্তী বেলটে গ্রামের অধিবাসী। ঠাকুরের অনুরাগী বৈষ্ণব ভক্ত। ঠাকুর নটবর গোস্বামীর গৃহে একবার গিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার ভাগ্নে হৃদয়ের সহিত সে সময়ে সাতদিন গোস্বামীজীর গৃহে ছিলেন। গোস্বামীজী ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই ভক্তিভরে ঠাকুরে সেবা করিতেন। ফুলুইয়ে বহু বৈষ্ণবের বাস ছিল এবং তাঁহারা প্রতিদিনই সংকীর্তন করিতেন। ঠাকুরকে সংকীর্তন শুনাইবার বাসনায় গোস্বামীজী নিকটবর্তী স্থান রামজীবনপুর ও কৃষ্ণগঞ্জের বিখ্যাত কীর্তনীয়া ও মৃদঙ্গবাদককে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবসমাধি দর্শনে বৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'যোগমায়ার আকর্ষণ' কাহাকে বলে -- ইহা ওইখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

নন্দ বসু (নন্দলাল বসু) -- ধনী ব্যক্তি। বাগবাজারে বাড়ি। তাঁহার গৃহে নানা দেবদেবীর সুন্দর ছবি আছে জানিতে পারিয়া ১৮৮৫ সালে বলরাম বসুর বাড়ি হইতে তথায় যান। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই সব ছবি দেখিয়া গৃহস্বামী এবং তাঁহার ভাই পশুপতি বসুর সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন। ঠাকুর ওই ছবিগুলির প্রশংসা করিয়া নন্দবাবুকে যথার্থ হিন্দু বলিয়া সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

নন্দলাল সেন -- কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে তিনি আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকবার দর্শন করেন। ১৮৮২ সালের ২৭শে অক্টোবর কেশবচন্দ্র সেন ঠাকুরকে এবং আরো অনেককে লইয়া স্টীমারে গঙ্গাভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। নন্দলাল সেই দলে ছিলেন। তিনি সেদিন ঠাকুরের ভাবাবিষ্ট অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী এবং বহু আধ্যাত্মিক আলোচনার শ্রোতা হন। নন্দলাল পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেনের ও ঠাকুরের অনুগামী ভক্ত হীরানন্দের সহিত সিন্ধু প্রদেশে যান এবং সেখানে সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।

নন্দিনী (নন্দিনী মল্লিক) -- ব্রাহ্মভক্ত মণিলাল মল্লিকের বিধবা কন্যা। তিনি ধর্মপরায়ণা ছিলেন এবং ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এক সময়ে তিনি কিছুতেই ধ্যানে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না। ঠাকুর এই সমস্যার কথা শুনিয়া তাঁহাকে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্রকেই (ভ্রাতুষ্পুত্র) বালগোপাল ভাবিয়া সেবা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ঠাকুরের আদিষ্ট পথ অবলম্বনে ইঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল।

নফর বন্দ্যোপাধ্যায় -- শিওড় নিবাসী সঙ্গতি সম্পন্ন ভক্তিমান ব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার শিওড় গিয়া কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। নফর সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

নবকুমার -- বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গী। নবকুমার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। এবং সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গাদি শুনেন। পরে বলরাম বসুর সহিত একই নৌকাতে কলিকাতা ফিরেন। আর একদিন ঠাকুরের নিকট ভক্ত সমাগম দেখিয়া, দম্ভভরে দরজার কাছ হইতে চলিয়া যাওয়ায়, ঠাকুর তাঁহাকে অহঙ্কারের প্রতিমূর্তি বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন।

নবগোপাল কবিরাজ -- ১৮৮৬ সালের মার্চ মাসে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ বৃদ্ধি পাইলে গিরিশবাবুর অনুরোধে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। এইভাবে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয়।

নবগোপাল ঘোষ (১৮৩২ - ১৯০৯) -- হুগলী জেলার বেগমপুরে গ্রামে জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত। নবগোপাল বাদুড় বাগানের বাসিন্দা। প্রথমবার ঠাকুরকে দর্শনের পর বহুদিন তিনি ঠাকুরের সঙ্গে আর যোগাযোগ করেন নাই। ঠাকুরই তাঁহার বন্ধু কিশোরীর কাছে তাঁহার খবর জানিতে চাহিলে নবগোপাল তাঁহার মত একজন সাধারণ মানুসকেও ঠাকুর স্মরণে রাখিয়াছেন জানিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হন। তিনি সস্ত্রীক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহার গৃহ ঠাকুরের পদধূলিতে ও নৃত্য গীতে ধন্য হইয়াছিল। নবগোপাল ঠাকুরের মধ্যে শ্রীচৈতন্য রূপ দেখিতে পান। ১৮৮৬-র ১লা জানুয়ারি ঠাকুর যখন কল্পতরু হইয়া সকলকে আশীর্বাদ করিতেছিলেন সেই সময় নবগোপালও উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি নবগোপালকে তাঁহার নাম বারংবার উচ্চারণ করিতে বলেন। তাহার পর হইতে নবগোপালের মুখে সবসময় "জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনি লাগিয়াই থাকিত। ১৮৯৮ সালে হাওড়ায় নবগোপালের নবনির্মিত গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃত স্থাপিত হয়। সেই শুভমুহূর্তে স্বামীজী "ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥" প্রণাম মন্ত্রটি রচনা করেন। সেইসময় বিবেকানন্দের গুরুভাইদের মধ্যেও অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবগোপালের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ স্নহ করিতেন। শ্রীসারদা দেবীও বলিয়াছিলেন -- "নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ।"

নবদ্বীপ গোস্বামী -- ১৮৮৩ সালে পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের চিড়ার মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগ দিতে গেলে সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামী তাঁহার দর্শন লাভ করেন। সেখানে মণিমোহন সেনের বাড়িতে উভয়ের মধ্যে ধর্মালোচনা হয়। এই উপলক্ষে ঠাকুর গীতার সার কথা "ত্যাগী" বলিলে নবদ্বীপ গোস্বামী তাহা প্রমাণ সহ সমর্থন করেন।

নবাই চৈতন্য -- প্রকৃত নাম নবগোপাল মিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্রের জ্যেষ্ঠতাত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত শ্রবণপূর্বক উচ্চ সংকীর্তনাদি করিতেন। পানিহাটীর উৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও কৃপালাভ করিবার পরে সংসারের ভার পুত্রের উপর দিয়া কোন্নগরে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটিরে দিবারাত্র জপধ্যান ও কীর্তনাদি করিতেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

নবীন নিয়োগী (নবীনচন্দ্র নিয়োগী) -- দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ভক্ত নবীন নিয়োগী প্রায়ই ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর নবীন নিয়োগীর গৃহে আয়োজিত নীলকণ্ঠ মুখার্জীর যাত্রা উপলক্ষে ঠাকুরের পদার্পণ হয়। সেদিন ঠাকুর নবীনচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রের ভক্তির প্রশংসা করেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন তাঁহার যোগ ও ভোগ দুইই আছে। দুর্গাপূজার সময় নবীন ও তাঁহার পুত্র মা-দুর্গাকে ব্যজন করিতেন। সাধনকালে দক্ষিণেশ্বরে ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর মণ্ডল ঘাটে থাকিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভৈরবীর সেখানে অবস্থানকালে নবীন নিয়োগীর ভক্তিমতী স্ত্রী তাঁহার সেবা ও যত্নের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নবীন সেন -- কেশবচন্দ্র সেনের জেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার কলুটোলার বাড়িতে কেশবের মাতাঠাকুরানীর নিমন্ত্রণে ঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মভক্তদের হিত কীর্তন করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র [নরেন্দ্রনাথ দত্ত] (১৮৬৩ - ১৯০২) -- ইনি পরবর্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত প্রখ্যাত অ্যাটর্নী ছিলেন। তিনি খুব উদার মনোভাবাপন্ন এবং প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী অতিশয় ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থপাঠে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। বীরেশ্বর শিবের কৃপায় তিনি পুত্র নরেন্দ্রনাথকে পাইয়াছিলেন। পুত্রের উপর মায়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নরেন্দ্রনাথ অতিশয় মেধাবী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। বালক নরেনের বুদ্ধিমত্তায় সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতেন। সমবয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ধ্যানপ্রবণ, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং অসমসাহসিক ও হৃদয়বান নেতা। একাধারে অনেক গুণের অধিকারী। বাল্যকাল হইতে সত্যনিষ্ঠা এবং দেবদেবীর প্রতি অনুরাগ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বিশেষ লক্ষিত হয়। কলেজের পাঠকালেই ঈশ্বরান্বেষী যুবক নরেন্দ্রনাথ একজন প্রকৃত ঈশ্বরদ্রষ্টাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। মন সময়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি বহু মনীসীর সান্নিধ্য লাভেও তৃপ্ত হন নাই। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সেই আকাঙ্খিত ঈশ্বরদ্রষ্টার সাক্ষাৎলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওই সাক্ষাৎকালে নরেন্দ্রনাথকে জানিতে পারেন যে এই সেই চিহ্নিত ঋষি যিনি লোকহিতার্থে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। নরেন্দ্র সেই দিনেই তাঁহার এতদিনের প্রশ্নের উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে মহূর্তমধ্যে পাইয়া যান। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ়কণ্ঠের উত্তর -- তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন; ভগবানকে তিনি নিজেই শুধু দেখেন নাই, অপরকেও দেখাইতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার সকল শক্তি নরেন্দ্রনাথকে অর্পণ করিয়া মহাসমাধি লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্তদের একত্র করিয়া বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক প্রথমে বিবিদিষানন্দ পরে সচ্চিদানন্দ ও শেষে বিবেকানন্দ নামে তিনি পরিচিত হন। তারপর পরিব্রাজক রূপে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া দেশের বাস্তবরূপের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হিয়াছিল। অবশেষে মাদ্রাজের যুবক ভক্তদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে আয়োজিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদান করিতে রওনা হন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে। অনেক অসুবিধার মধ্যে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত সম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়া হিন্দুধর্মের মহিমা ঘোষণা করেন। উক্ত সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়া জগৎসভায় ভারতের প্রতিষ্ঠাপূর্বক বিপুল সাফল্য লাভ করেন। আমেরিকার নানা স্থানে ঘুরিয়া ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন ও বেদান্তের প্রচার করা এই সময়ে তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপেও তিনি বেদান্ত প্রচার করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরিলে কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত সর্বত্র অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা লাভ করেন। নানাস্থানে বক্তৃতার পরে ভাবী রামকৃষ্ণ মিশন গঠনের কাজে উদ্যোগী হন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন।

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -- অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তিনি স্ত্রী-পুত্র সহ শ্যামপুকুরে বাস করিতেন। এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সঙ্গলাভে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

নরোত্তম -- কীর্তনীয়া। ঠাকুরের ভক্তেরা নিজেদের গৃহে উৎসবের ব্যবস্থা করিলেই কীর্তনগানের জন্য নরোত্তমকে আমন্ত্রণ করিতেন। ঠাকুর এই কীর্তনীয়াকে খুব স্নেহ করিতেন।

নারায়ণ -- কলিকাতার সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। সরল ও পবিত্র স্বভাবের জন্য ঠাকুর তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। নারায়ণ কথামৃত প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছাত্র। বাড়ির লোকের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দৈহিক নির্যাতন সহ্য করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। তাঁহার প্রতি এই শারীরিক অত্যাচারের জন্য ঠাকুর ব্যাথা বোধ করিতেন। অল্প বয়সেই নারায়ণ দেহত্যাগ করেন।

নারায়ণ শাস্ত্রী -- রাজস্থানের অধিবাসী। দার্শনিক, পণ্ডিত এবং ঠাকুরের ভক্ত। সাধনকালে তিনিঠাকুরের দিব্যোন্মত্ত অবস্থা দেখিয়াছিলেন। পরে নবদ্বীপ হইতে নবন্যন্যায়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ফিরিবার পথে ঠাকুরের

ভাবময় মূর্তি ও সমাধি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ঠাকুরের মধ্যে শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ উপলব্ধ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান। পরে ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বশিষ্ঠাশ্রমে তপস্যা করিতে চলিয়া যান। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবের সহিত ঠাকুরের মিলনের আগে তিনি ঠাকুরের নির্দেশে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন এবং ঠাকুরকে জানান যে কেশব জপে সিদ্ধ। দক্ষিণেশ্বরে মাইকেল মধুসূদনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের সময় শাস্ত্রীজী সেখানে উপস্থিত থাকিয়া মাইকেলের সঙ্গে সংস্কৃতে কথা বলেন।

নিতাই মল্লিক -- ডাক্তার নিতাই মল্লিক দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশও তিনি শুনিয়াছিলেন।

নিত্যগোপাল [নিত্যগোপাল বসু -- জ্ঞানানন্দ অবধূত] (১৮৫৫- ১৯১১) -- শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত। রামচন্দ্র এবং মনোমোহন মিত্রের মাসতুতো ভাই। তুলসীচরণ দত্ত (পরে স্বামী নির্মলানন্দ) নিত্যগোপালের ভাগিনেয়। কলিকাতা আহিরীটোলায় বিখ্যাত বসু বংশের সন্তান। পিতা জনমেজয়, মাতা গৌরী দেবী। নিত্যগোপাল কখনো একা কখনো রামচন্দ্রের সহিত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ঠাকুর তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সম্পর্কে 'পরমহংস অবস্থা' বলিতেন। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন যে তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভ বিশেষ সাধন-ভজনাদির উদ্যোগ ব্যতীতই হয়। নিত্যগোপালের পৃথক ভাবে জন্য ঠাকুর তাঁহার অন্যান্য ভক্তদের তাঁহার সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন, "ওর ভাব আলাদা, ও এখানকার লোক নয়।" ঠাকুরের তিরোধানের পর ঠাকুরের অস্থিভস্ম কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে রাখা হয় এবং নিত্যগোপাল তখন পাঁচ-ছয় মাস কাল ঠাকুরের নিত্যপূজা করিতেন। নিত্যগোপাল সেইসময়ে দিনের অধিকাংশ সময় ধ্যান করিয়া কাটাইতেন। তিনি 'জ্ঞানানন্দ অবধূত' নাম গ্রহণ করেন। ১১৩ নং রাসবিহারী এভেনিউতে 'মহানির্বাণ মঠ' স্থাপন করেন। পানিহাটিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অন্য মঠের নাম কৈবল্য মঠ। তাঁহার রচিত প্রায় ২৫ খানা গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে।

নিরঞ্জন [নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ -- স্বামী নিরঞ্জনানন্দ] (১৮৬২ - ১৯০৪) -- নিরঞ্জনের জন্ম ২৪ পরগণার রাজারহাট বিষ্ণুপুরে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ নামে সুপরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী সন্তানের মধ্যে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ অন্যতম ও ছয় জন ঈশ্বরকোটির অন্যতম। নিরঞ্জনের বাল্যকাল মাতুলালয়ে কাটে। তাঁহার অতি সুন্দর চেহারা ব্যায়ামাদির ফলে সুদীর্ঘ, সবল ও সুঠাম ছিল। তাঁহার প্রকৃতিও অনুরূপ নির্ভীক ও বীরভাবাপন্ন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিবার পূর্বে তিনি এক প্রেততত্ত্বান্বেষী দলের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই প্রেততত্ত্বানুসন্ধিৎসু জনকয়েক বন্ধুর সহিত নিরঞ্জন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন। প্রথম দর্শনে নিরঞ্জন দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যায় সকলে উঠিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনের এমন অনতরঙ্গভাবে খবর নেন, যেন কতকালের পরিচিত। সেই সময়ই তিনি নিরঞ্জনকে জানাইয়া দেন যে, মানুষ ভূত ভূত করিতে থাকিলে ভূত হইয়া যায়, আর ভগবান ভগবান করিলে মানুষই ভগবান হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন স্থির করিলেন যে, ভগবান ভগবান করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হওয়া উতিত। প্রথম দিন হইতেই নিরঞ্জনের সরলতা শ্রীরামকৃষ্ণের মন জয় করে। নিরঞ্জনের সরলতা ও বৈরাগ্যের জন্য ঠাকুর তাঁহার প্রতি কতখানি স্নেহপরায়ণ ছিলেন তাহার উদাহরণ কথামৃতের বহু জায়গায় দেখা যায়। বলরামভবনে একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ না নিরঞ্জন কিছুতেই লিপ্ত নয়।" এছাড়া আরও অনেক গুহ্য কথা বলিয়াছিলেন নিরঞ্জন সম্পর্কে। দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর নিরঞ্জনকে আলিঙ্গন করিয়া আকুলস্বরে ভগবান লাভের জন্য ব্যগ্র হইতে বলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন এই ভালবাসায় অভিভূত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের এমন প্রাণঢালা

ভালবাসা ছিল, যার উদাহরণ নিরঞ্জনের ভাষায়, "আগে ভালবাসা ছিল বটে, কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার যো নাই।" কর্তব্যানুরোধে ও বৈরাগ্যের আবেগে নিরঞ্জনকে আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মনে হইলেও তাঁহার চরিত্রে কোমলতার অভাব ছিল না। এককথায় প্রয়োজন বোধে তিনি যেমন বজ্রাদপি কঠোর হইতেন, তেমনি আবার কুসুমাদপি মৃদুও হইতে পারিতেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দ নামে অভিহিত হন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের তপস্যার দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল। তবে গুরুভাইদের কাহাকেও অসুস্থ দেখিলে তিনি সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। তাঁহার শেষ সময় হরিদ্বারে অতিবাহিত হয়।

নিরঞ্জনের ভাই -- স্বামী নিরঞ্জনানন্দের পূর্বাশ্রমের ভাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কালীপূজার দিনে দক্ষিণেশ্বরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে ধ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সেই ধ্যানের প্রশংসা করেন।

নীলকণ্ঠ [নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়] (১৮৪১ - ১৯১১) -- ইনি বর্ধমানের ধরণী গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা দলে প্রথম ছীলেন। সুগায়ক নীলকণ্ঠ কৃষ্ণযাত্রায় দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার যাত্রা দলের মালিক হন। কবিত্ব শক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'কৃষ্ণযাত্রা' বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়ায় খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। 'কালীর দমন' (কৃষ্ণলীলা) নীলকণ্ঠের রচিত শ্রেষ্ঠ পালা। তিনি নিজে ওই যাত্রায় রাধার সখীরূপে অত্যন্ত সুন্দর অভিনয় ও গান করিতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের নিকট হইতে 'গীতরত্ন' উপাধি লাভ করেন। নীলকণ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনাইয়া মুগ্ধ করেন। ঠাকুরও তাঁহাকে গান শুনাইয়া ধন্য করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠের যাত্রা অনুষ্ঠান দেখিতে আগ্রহী শ্রীরামকৃষ্ণ হাটখোলার বারোয়ারী তলায় গিয়াছিলেন। পরে আর একবার ঠাকুর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নবীন নিয়োগীর গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনেন। সেদিনও তিনি সমাধিস্থ হন। নীলকণ্ঠ ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁহার মতো সংসারী জীবের গতি কি। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে, তিনি (নীলকণ্ঠ) ভগবান দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহার নামগান, ভক্তিরসের ধারা সাধারণ মানুষের মনে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। তাহার পর তিনি নীলকণ্ঠকে মায়ের গান করিতে অনুরোধ করিলেন। মধুর কণ্ঠে গান শুনিয়া তিনি ভাববিভোর হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে নীলকণ্ঠ তাঁহার গানের যথার্থ পুরস্কার পাইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, দুর্লভ রত্ন নীলকণ্ঠের নিজের কাছেই আছে।

নীলমণিবাবু -- অধ্যাপক। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত শ্যামপুকুরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তাঁহার কথামৃত পান করেন।

নীলমাধব সেন (গাজীপুরের ব্রাহ্মভক্ত) -- তিনি গাজীপুর হইতে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার ব্রাহ্মভক্তদের সহিত ঠাকুর যখন গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় নীলমাধব সেনও উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি বাহ্যজগতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন নীলমাধব ও অপর একজন ভক্ত ঠাকুরের ছবি ঘরে রাখেন। তাহাদের কথা শুনিয়া ঠাকুর স্মিত হাসেন এবং নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া বলেন যে শরীরটা কেবলমাত্র খোল।

ন্যাংটা (তোতাপুরী) -- শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত বেদান্ত সাধনার গুরু। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা মঠের পুরীনামা দশনামা সম্প্রদায়ভুক্ত অদ্বৈতবাদী নাগা সন্ন্যাসী। দীর্ঘ ৪০ বৎসর সাধনার পর নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে পুরী ও গঙ্গাসাগর তীর্থ করিয়া ফিরিবার পথে তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এখানে ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। তোতাপুরী বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসীদের মঠে ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা দিগম্বর থাকিতেন বলিয়া (ন্যাংটা) নাগা বা নাংগা সাধু সম্প্রদায় বলা হইত।

তোতা অল্প বয়সেই গুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বহুদিন নর্মদাতীরে কৃচ্ছ্রসাধন করেন এবং অবশেষে নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র তোতাপুরী তঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি ঠাকুরকে বেদান্ত শিক্ষা দিতে পারেন কিনা প্রশ্ন করিলে ঠাকুর বলেন যে সবই মায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অবশেষে ঠাকুর মায়ের আদেশানুসারে তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত সাধনা করেন। সন্ন্যাসদীক্ষান্তে তিনদিনের মধ্যেই ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়াছিল। তোতাপুরী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের মন সম্পূর্ণভাবে বাহ্যজগৎ হইতে প্রত্যাহৃত। তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা দেখিয়া তোতাপুরী বিস্মিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বৎসরের কঠিন সাধনার পর যাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র অল্প সময়েই লাভ করিয়াছিলেন। তিনদিনের পরিবর্তে ১১ মাস অতিবাহিত করার পর, তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যান। যাইবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যবশতঃ তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন, একই সত্তা।

পওহারীবাবা [হরভজন দাস] (১৮৪০ - ১৮৯৮) -- উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের নিকটবর্তী প্রেমপুরে (গুজি) মতান্তরে বারাণসী জেলার গুজি নামক স্থানের নিকটবর্তী এক গ্রামে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। পিতা অযোধ্যা তেওয়ারী। শৈশবে বসন্তরোগে তাঁহার একচক্ষু নষ্ট হয়। কাকা লক্ষ্মীনারায়ণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং অল্প বয়সেই সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য গৃহত্যাগী। বহু বৎসর পরে গাজীপুরের তিন মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরে কুর্থ নামক গ্রামের আশ্রমে লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থান কালে হরভজন তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহার উপনয়নের পর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করান। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের দেহত্যাগের পর আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বাবাজী পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা ও বদ্রীনাথ তীর্থাদি দর্শন করেন। এ সময়ে গির্নার পর্বতে এক যোগীর কাছে উপদেশ লাভ করেন এবং হিমালয়ের এক যোগীর নিকট এক উদ্ভিদের সন্ধান পান যাহা খাইয়া অন্য খাদ্য ব্যতীতই বহুদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। আশ্রমে ফিরিয়া সাধুর জীবনযাপন কালে শুধুমাত্র লঙ্কা ও দুধ আহার্য গ্রহণ করিতেন। পরে শুধু বিল্বপত্রের রস পান করিতেন। সেজন্য লোকে পওহারীবাবা বলিত। পুরী যাত্রার পথে মুর্শিদাবাদে বাংলা ভাষা শিখিয়া চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন। তামিল, তেলেগু ভাষা শিখিয়া দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের এক বৈষ্ণব সাধুর নিকট তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গাজীপুরের নিকটে এক যোগীর কাছে তিনি যোগশিক্ষা করেন। আশ্রমের এক মৃত্তিকা গহ্বরে তিনি যোগাভ্যাস করেন। জনতাকে প্রতি একাদশীতে দর্শন দান করিতেন। পরে বৎসরে একদিন মাত্র দর্শন দানের জন্য বাহিরে আসিতেন। দীর্ঘকাল গুহায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার গুহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ফটো ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী তাঁহার সহিত আলাপাদি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথামৃতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে ত্রৈলোক্যের কথোপকথনে পওহারীবাবার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বাবাজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে স্বামীজী তাঁহার উচ্চাবস্থার কথা একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন।

পণ্ডিতজী -- বড়বাজারের ভক্ত মারোয়াড়ীর গৃহে (১২ নং মল্লিক স্ট্রীটে) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাগমন কালে পণ্ডিতজী তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন। তাঁহার পুত্রও ওইদিন ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন।

পদ্মলোচন (পণ্ডিত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার) -- বেদান্তবাদী, ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম অনুরাগী। তিনি বর্ধমান মহারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। পদ্মলোচনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই সময়ে পদ্মলোচন ভগ্ন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আড়িয়াদেহের একটি বাগানবাড়িতে ছিলেন। মিলনে উভয়েই আনন্দিত হন। ঠাকুরের মুখে তাঁহার উপলব্ধি সমূহ ও মায়ের গান শুনিয়া তিনি অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতের সিদ্ধাই-এর বিষয় ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন

বলিয়া তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ইষ্টজ্ঞানে স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। কাশীতে তিনি দেহরক্ষা করেন।

পল্টু (প্রমথনাথ কর) -- কম্বুলিয়াটোলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র করের পুত্র। এ্যটর্নী হিসাবে বিখ্যাত। মাস্টার মহাশয়ের ছাত্র হিসাবে খুব শৈশবেই ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার ভক্ত হন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন "তোরও হবে। তবে একটু দেরিতে হবে।" পরবর্তী জীবনে তিনি বহু পরহিতব্রতী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

পশুপতি (পশুপতি বসু) -- নন্দলাল বসুর ভাই। বাসস্থান -- বাগবাজার, কলিকাতা। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়িতে রক্ষিত দেবদেবীর সুন্দর ছবিগুলি দর্শনের জন্য শুভাগমন করিয়া সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। পশুপতি তাঁহাকে দেবদেবীর ছবিগুলি দর্শন করাইয়া সুখী হন। ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পশুপতির অহংকারশূন্য মনোভাবের জন্য ঠাকুর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন ও কিছুক্ষণ নন্দবাবু প্রভৃতির সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন।

পাগলী -- কথামৃতে এক পাগলিনীর উল্লেখ আছে। সে দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে ঠাকুরের নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই সুগায়িকা পাগলীকে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে আনয়ন করেন। কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাহার অন্যভাবে কথা প্রকাশ করায় ঠাকুর বিরক্ত হন। যখন তখন আসিয়া সে ঠাকুরের নিকট গান করিত।

পান্না কীর্তনী (পান্নাময়ী) -- বিখ্যাত মহিলা কীর্তনীয়া। পদাবলী কীর্তনে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে কীর্তন উপলক্ষে ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর তাঁহার ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে পান্নার সুকণ্ঠের প্রশংসা করেন এবং তাঁহার ভক্তির কথা উল্লেখ করেন।

পাঁড়ে জমাদার (খোট্টা বুড়ো) -- শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের নিকট কামিনী-কাঞ্চন প্রসঙ্গে তাহার তরুণী স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণে তাহাকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হইত -- উল্লেখ করিয়াছিলেন।

পিগট (মিস্) -- আমেরিকান পাদ্রী। যোশেফ কুকের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের স্টীমারে (২৩-২-১৮৮২) শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেদিন ঠাকুরের গান এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা শুনিয়া এবং ঠাকুরের ভাবসমাধির অবস্থা দেখিয়া যোশেফ কুক এবং মিস্ পিগট অভিভূত হইয়াছিলেন।

পূর্ণ [শ্রী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ] (১৮৭১ - ১৯১৩) -- কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্ম। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। গৃহীভক্তদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকেই ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় অতি শৈশবেই মাস্টার মহাশয়ের পরামর্শে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। পিতা রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ -- উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। ঠাকুর পূর্ণকে বলিয়াছিলেন যে যখনই তাহার সুবিধা হইবে তখনই যেন সে ঠাকুরের নিকট আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন পূর্ণচন্দ্রের 'বিষ্ণুর অংশে জন্ম' এবং তাঁহার আগমনে ওই শ্রেণীর ভক্তদের আগমন পূর্ণ হইল। বাহিরে সরকারীকাজে নিযুক্ত থাকিলেও অন্তরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ও চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। স্বামীজীর মহিলাভক্ত মাদাম কালভে কলিকাতায় যখন আসেন, সে সময় তিনি তাঁহাকে বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক হিসাবে উক্ত সোসাইটির পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করেন। মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

প্রতাপ ডাক্তার (১৮৫১ - ১৯১২) -- বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রামে জন্ম। কলিকাতায় চিকিৎসা-বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। এই সময়ে ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করিয়া এবং তাঁহার অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শনে বিজ্ঞান জগতের প্রতাপচন্দ্র মোহিত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোতে World's Columbian Exposition-এ আমন্ত্রিত হন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৪০ - ১৯০৫) -- বাসস্থান কলিকাতা। পিতা গিরীশচন্দ্র মজুমদার। প্রতাপচন্দ্র বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। জন্ম হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে মাতুলালয়ে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ভারত, ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কেশবচন্দ্র সেনের দেহত্যাগের পর নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নেতা হন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি বহুবার গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ Hindu Saint জনপ্রিয়তা লাভ করে। Oriental Christ, Paramhamsa Ramakrishna প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচনা। ১৮৯৩ সালে প্রতাপচন্দ্র শিকাগো ধর্মসভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া ভাষণ দিয়াছিলেন এবং সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে সাক্ষাৎ হয়। কলিকাতায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

প্রতাপ সিং -- একজন ডেপুটি। ঠাকুর কামারপুকুরে তাঁহার দানধ্যান ও ঈশ্বরে ভক্তি ইত্যাদি অনেক গুণের কথা শুনিয়াছিলেন। ইনি ঠাকুরকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।

প্রতাপচন্দ্র হাজরা -- হুগলী জেলার মড়াগেড়ে নামক গ্রামে বাড়ি। কামারপুকুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম। শিহড় গ্রামে হৃদয়ের বাড়িতে প্রথম তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান। কয়েক বৎসর পরে বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও বৃদ্ধা মাতাকে রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসেন। কিন্তু তাঁহার কিছু ঋণ ছিল। দক্ষিণেশ্বরে তিনি ‘হাজরামশাই’ নামে পরিচিত ছিলেন। হাজরার নিরাকারবাদের সমর্থন পাইয়া নরেন্দ্রনাথও প্রথমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। হাজরাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিতেন -- ‘জটিলে কুটিলে’ থাকলে লীলা পোষ্টাই হয়। নরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় হাজরা ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। অন্তিম সময়ে ঠাকুরের দর্শন পান। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৬২।৬৩ বৎসর বয়সে স্বগ্রামে হাজরা লোকান্তরিত হন।

প্রতাপের ভাই -- শ্রীম-র দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় দর্শন দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কথা উল্লেখ করেন। বেকার অবস্থায় স্ত্রী-পুত্রকে শ্বশুরবাড়িতে রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। সেজন্য ঠাকুর তাহাকে গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইনি কোন্ প্রতাপের ভাই তাহা জানা যায় না।

প্রসন্ন (প্রসন্নকুমার সেন) -- ব্রাহ্মভক্ত। জন্ম -- ২৪ পরগণা -- গরিফা। কেশব সেনের অনুগামী শিষ্য। ঠাকুরের শুভদর্শন লাভে তিনি আশীর্বাদ ধন্য হইয়াছিলেন। কমলকুটীরে কেশব সেনের অসুস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে দেখিতে গেলে তিনি ঠাকুরকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলেন।

প্রসন্ন [সারদাপ্রসন্ন মিত্র -- স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ] (১৮৬৫ - ১৯১৫) -- চব্বিশ পরগণা জেলার নাওরা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র। মাতামহ পাইকহাটীর নীলকমল সরকার একজন জমিদার। সারদাপ্রসন্ন ছিলেন কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছাত্র। মেধাবী হইয়াও প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বিশেষ দুঃখ পান। মাস্টার মহাশয় এইজন্য বিষাদগ্রস্ত ছাত্রকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের

নির্দেশে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে লইতেন। অভিভাবকগণ তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিলে তিনি গৃহ হইতে পলাইয়া যান। প্রথমে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যান। পরে পুরীধামে পথে রওনা হন। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরাহনগরে মঠে যোগ দেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁহার নাম হয় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। দুঃসাহসিকতার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় তীর্থ ভ্রমণের সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তীর্থ হইতে ফিরিয়া নানা জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশনা এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্ত প্রচারে বিদেশযাত্রা তাঁহার কর্মময় জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমেরিকার সানফ্রান্সিস্‌কো, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি শহরে বেদান্ত প্রচারের কাজে তাঁহার শেষ জীবন কাটে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে হিন্দুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্যে এইটি প্রথম হিন্দুমন্দির। ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে 'শান্তি আশ্রম' নামে একটি শাখাকেন্দ্র শুরু করিয়াছিলেন। Voice of Freedom নামে একটি মাসিক পত্র এবং লস এঞ্জেলস নগরে বেদান্ত সমিতি স্থাপন তাঁহার বিশেষ উদ্যোগের পরিচায়ক। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন।

প্রাণকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) -- হুগলি জেলার জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় বংশীয় শ্রীরামকৃষ্ণে ভক্ত। স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া 'মোটা বামুন' নামে ঠাকুর তাঁহাকে উল্লেখ করিতেন। কলিকাতায় শ্যামপুকুর অঞ্চলে রামধন মিত্র লেনে থাকিতেন। সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিতেন। ঠাকুরকে নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং বেদান্তচর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

প্রিয় [প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়] -- শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত, ইঞ্জিনীয়ার, বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ার বাসিন্দা। তিনি মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উভয়েই থিয়োসফিস্ট হইলেও ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন।

প্রিয় (প্রিয়নাথ সিংহ) -- নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী বন্ধু -- ব্রাহ্মভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ও সিমুলিয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি দর্শনাদি করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি খ্যাতনামা শিল্পী হন। 'গুরুদাস বর্মণ' এই ছদ্মনামে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' রচনা করেন। বাল্য-বয়সেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁহার রচনায় স্বামীজী সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। 'স্বামীজীর কথা' পুস্তকে এই স্মৃতিকথা প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর যে নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ দ্বারা অদ্বৈতানুভূতি দান করেন তাহার একটি সুন্দর রঙিনচিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছিলেন।

প্রেমচাঁদ বড়াল -- বহুবাজার নিবাসী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। ব্রাহ্মভক্ত মণি মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটীর বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পরিবারস্থ লালচাঁদ বড়াল ও রাইচাঁদ বড়াল প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক।

ফকির -- প্রকৃত নাম যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য। বলরাম বসুর পুরোহিত বংশের সন্তান এবং কিছুকাল বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর গৃহশিক্ষকরূপেও নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত শুরু করেন এবং ক্রমে তাঁহার ভক্ত হন। ঠাকুর ফকিরের মুখে দেবদেবীর স্তব শুনিতে ভালোবাসিতেন।

বঙ্কিম -- মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরিচিত। বাগবাজার স্কুলের ছাত্র। শ্যামপুকুর বাটীতে তাহার খোঁজ লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন -- সে যদি না আসতে পারে, তাহাকে মাস্টার মহাশয় যেন ভগবৎকথা বলেন। তাহা হইলেই তাহার চৈতন্য হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪) -- সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। পেশায় ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট। "বন্দেমাতরম্" সংগীতের স্রষ্টা। বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্কিমচন্দ্র ২৪ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর শোভাবাজারের অধরলাল সেনের বাড়িতে দর্শন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন ঠাকুরকে ধর্ম সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং যথাযথ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের পাঠ শুনিয়াছিলেন এবং গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ বঙ্কিমবাবু উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করায় খুশি হইয়াছিলেন। কথামৃতে ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথনটি বঙ্কিমবাবুকে গভীরভাবে চিন্তাশীল করিয়াছিল। পরবর্তী কালে মাস্টার মহাশয় ও গিরিশবাবু ঠাকুরের নির্দেশে বক্ষকিমবাবুর সানকীভাঙ্গার বাসায় গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

বলরাম [বলরাম বসু] (১৮৪২ - ১৮৯০) -- বলরামবসু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান গৃহীভক্তদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রসদদারদের মধ্যে একজন। কলিকাতার বাগবাজারে জন্ম। পিতা রাধামোহন। পিতামহ গুরুপ্রসাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর বিগ্রহের নামানুসারে ওই অঞ্চলের নাম হয় শ্যামবাজার। ওই অঞ্চলের কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট আজও বলরামের প্রপিতামহের গৌরবময় স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। হুগলী জেলার আঁটপুর-তড়া গ্রামে পূর্বপুরুষদর আদি নিবাস। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় জমিদারি ও কোঠার মৌজায় কাছারি বাড়ির পত্তন হয় পিতামহের সময়। পিতার তিন পুত্রের মধ্যে বলরাম দ্বিতীয়। শৈশব হইতেই বলরাম ধর্মভাবাপন্ন। এই বৈষ্ণব পরিবারের সকলেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। শ্রীধাম বৃন্দাবনেও শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করেন পিতামহ গুরুপ্রসাদ। বর্তমানে উহা 'কালাবাবুর কুঞ্জ' নামে পরিচিত। বলরাম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের বলরামকে চিনিয়া লইতে দেরি হয় নাই। একমাত্র বলরামের বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাধিকবার আগমন ঘটে। বলরামের অন্ন "শুদ্ধ অন্ন" -- একথাও ঠাকুরের মুখে শোনা যায়। তিনি বলরামকে শ্রীচৈতন্যের কীর্তনের দলে দেখিয়াছিলেন। বলরামের সহধর্মিণী কৃষ্ণভাবিনীকে শ্রীমতীর (রাধারানীর) অষ্ট সখীর প্রধানা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। একবার শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী অসুস্থা হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঠাকুর শ্রীমা শ্রীসারদা দেবীকে দক্ষিণেশ্বের হইতে বলরাম বসুর গৃহে পাঠান। প্রতিবৎসর রথের সময় ঠাকুরকে বাসভবনে লইয়া আসিতেন বলরাম। এখানে ঠাকুর রথের সম্মুখে কীর্তন নৃত্যাদি করিতেন ও রথ টানিতেন। ঠাকুর বলিতেন বলরামের পরিবার সব একসুরে বাঁধা। বলরাম শুধু নিজ পরিবার নয়, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবও যাহাতে ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইতে পারে সেজন্য তাঁহাদিগকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির দিন পর্যন্ত তিনি ঠাকুরের প্রয়োজনীয় নিত্য আহার্যের দ্রব্যসমূহ যোগাইতেন। ঠাকুরের অদর্শনের পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের কাছে বলরামের ভবন একটি আশ্রয়স্থল ছিল। এই ভবন বর্তমানে "বলরাম-মন্দির" নামে পরিচিত। এইখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীশ্রীমাও এই বাড়িতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। বলরামবাবুর পুরীর আবাস এবং বৃন্দাবনের কালাবাবুর কুঞ্জ ছিল ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সাধন ভজনের উপযোগী স্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার ইতিহাসে অন্য কোনও ভক্ত পরিবারের এরূপ সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায় না। মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের উপস্থিতিতে বলরাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯১৯ সালে কৃষ্ণভাবিনী দেবীর ৺কাশীপ্রাপ্তি হয়।

বলরামের পিতা (রাধামোহন বসু) -- ইনি অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। অধিকাংশ সময় কালাবাবুর

কুঞ্জে একাকী বাস করিতেন। শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের সেবার তত্ত্বাবধান এবং অবসর সময়ে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ এবং বৈষ্ণবসেবায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কোঠারে থাকাকালেও এইরূপ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় শান্তির অধিকারী হইয়া বলরাম তাঁহার ধর্মপ্রাণ পিতাকে ঠাকুরের সান্নিধ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর রাধামোহন বসু বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে জীবন ধন্য করেন ও ভগবৎ দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা এবং ধর্মজীবনে উদার দৃষ্টিভঙ্গিলাভের প্রেরণালাভ করেন।

বাবুরাম [বাবুরাম ঘোষ -- স্বামী প্রেমানন্দ] (১৮৬১ - ১৯১৮) -- হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা আঁটপুর নিবাসী তারাপদ ঘোষ, মাতা মাতঙ্গিনী দেবী। বাবুরাম পরবর্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী প্রেমানন্দ নামে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত ছয়জন ঈশ্বরকোটির মধ্যে তিনি একজন। কলকাতায় পড়াশুনা করিবার সময় সহপাঠী রাখালচন্দ্র ঘোষের (পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়া প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেইদিনই বাবুরামকে আপনজন বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি বাবুরামকে দরদী, 'বাবুরামের হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ' -- বলিতেন। ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দেবী, বাবুরামের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পরম ভক্তিমতী মাতা মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এই পুত্রকে তাঁহাকে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ সৌভাগ্যজ্ঞানে পুত্রকে ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করেন। দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে বাবুরাম নানাভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি তিনবার পূর্ববঙ্গে গমন করেন। প্রতিবারেই সেখানে বহুভক্তের মধ্যে প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত দেওভোগ গ্রামে নাগমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া ভাবাবেগে নাগ প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দেন। স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন মঠের স্বাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের জননীর মতো। নানাদেশ হইতে আগত সকলকে তিনি বেলুড়মঠের তখনকার নানা অসুবিধার মধ্যেও মিষ্ট আলাপাদি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে সেবা করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় বেলুড়মঠে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের জন্য একটি চতুষ্পাঠী (টোল) স্থাপিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের অসীম ভক্তি ছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই, মঙ্গলবার, বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে বলরাম-মন্দিরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিজয় [বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী] (১৮৪১ - ১৮৯৯) -- শান্তিপুরের বিখ্যাত অদ্বৈত বংশে জন্ম। পিতা আনন্দচন্দ্র গোস্বামী। বাল্যবয়স হইতেই ঈশ্বর অনুরাগ লক্ষিত হয়। বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। পরে কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের কোন কোন আচরণ তিনি সমর্থন করেন নাই। যদিও তিনি নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তথাপি গয়াতে এক যোগীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং যৌগিক সাধন প্রক্রিয়াদি অভ্যাস করিতে থাকেন। মতপার্থক্যের জন্য ১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসংঘ ত্যাগ করেন এবং সনাতন হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম আজও বিদ্যমান। পরবর্তী কালে তিনি বহু ব্যক্তিকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাদের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি বহুবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই তিনি ষোলআনা ভগবদভাবের প্রকাশ দেখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অহেতুকী ভালবাসার প্রভাবে তাঁহার ধর্মজীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। শেষজীবনে তিনি পুরীধামে সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া এক শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানেই দেহত্যাগ করেন।

বিজয়ের শাশুড়ী -- শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী মহিলা ভক্ত। রামচন্দ্র ভাদুড়ীর ভক্তিমতী সহধর্মিণী। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ও ব্রাহ্ম উৎসবস্থলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন। ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভে এবং তাঁহার নানাবিধ উপদেশ শ্রবণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। আজীবন তিনি ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত

ছিলেন।

'বিদ্যা' অভিনেতা -- প্রকৃত নাম ভোলানাথ বসু। প্রখ্যাত যাত্রাশিল্পী। "বিদ্যাসুন্দর" নাটকে বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তিনি "বিদ্যা অভিনেতা" রূপে খ্যাতি লাভ করেন। ঠাকুর একদা দক্ষিণেশ্বরে "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রায় বিদ্যার ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনা করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

বিনোদ (বিনোদবিহারী সোম) -- মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর ছাত্র। বন্ধুদের কাছে তিনি 'পদ্মবিনোদ' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে অভিনয় করিতেন ও সঙ্গদোষে মদ্যপায়ী হন। একদিন থিয়েটার হইতে ফেরার পথে রাত্রিতে মায়ের বাড়ীর সম্মুখে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে একটি গান করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হন এবং দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণকথামৃত হইতে পাঠ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা পালিত হয় এবং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিনোদিনী (১৮৬৩ - ১৯৪২) -- কলিকাতার বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বিনোদিনীর নাট্যগুরু। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার দলের সঙ্গে ভারত ভ্রমণ করেন। ১৮৭৭ সালে গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেন। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় এবং স্বীয় প্রতিভায় বিনোদিনী শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেত্রী রূপে খ্যাত হন। তাঁহার নিঃশ্বার্থ কর্মের ফলেই স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। সহকর্মীদের অবিচারে এবং নানা কারণে তিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অভিনয় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'বাসনা' (কাব্যগ্রন্থ), কনক ও নলিনী (কাহিনী-কাব্য), 'আমার অভিনেত্রী জীবন' উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর বিনোদিনী ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। ওইদিন গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় বিনোদিনীর অসামান্য অভিনয় দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অভিভূত হন এবং বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনী অভিনীত প্রহ্লাদচরিত, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত, বৃষকেতু ইত্যাদি নাটকগুলি দেখেন এবং বিনোদিনীর অভিনয়ের প্রশংসা করেন। ঠাকুরের অসুস্থতার কথা শুনিয়া ব্যাকুলচিত্তে বিনোদিনী কালীপদ ঘোষের সহায়তায় এক ইওরোপীয় পুরুষের ছদ্মবেশে শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বিশেষ প্রীত হন এবং আশীর্বাদ করেন।

বিপিন সরকার -- হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শন করেন। সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভরের বালিকা কন্যা -- শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্যা ৬।৭ বছরের বালিকা। একদা বলরাম-মন্দিরে রথজাত্রা উপলক্ষে এই বালিকা ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলে ঠাকুরও তাঁহাকে মাথা অবনত করিয়া প্রতিনমস্কার জানান। অতঃপর ঠাকুর স্নেহবশে এই বালিকাকে 'কেলুয়ার গান' শুনাইয়া আনন্দ দান করেন।

বিশ্বাসবাবু (অম্বিকাচরণ বিশ্বাস) -- খড়দহের মর্যাদাসম্পন্ন ধনী জমিদারের দত্তক সন্তান। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গিনী 'যোগীন-মা'র স্বামী, বলরাম বসুর আত্মীয়। নিজ কর্মদোষে নিঃস্ব এবং মর্যাদাহীন হইয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু -- আড়িয়াদহ নিবাসী তরুণ ভক্ত এবং স্কুলের ছাত্র। ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভের জন্য প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। সংসার-বিতৃষ্ণ বিষ্ণু পশ্চিমাঞ্চলে আত্মীয়ের নিকট অবস্থানকালে নির্জনে ধ্যান করিতেন; এবং নানাবিধ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিতেন। এই উদাসী বালক-ভক্তটি গলায় ক্ষুর দিয়া আত্মহত্যা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, বোধ হয় -- শেষ জন্ম, পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকি ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হয়ে গেল।

বিহারী (বিহারী মুখোপাধ্যায়) -- শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। বীরভূমের অধিবাসী, চাকরীর খোঁজে কলিকাতার আসেন। ভাগ্যক্রমে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে যান এবং তাঁহার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। শ্যামপুকুর বাটীতে বিহারী কালীপূজা দিবসে স্তব ও গান করিয়াছিলেন।

বিহারীলাল ভাদুড়ী -- ভাদুড়ী ডাক্তার -- প্রবীন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। বাড়ি কর্নয়ালিস স্ট্রীটে। শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এইসময়েই তিনি ঠাকুরের কথামৃত পান ও ভাবসমাধি দর্শনের সোভাগ্য লাভ করেন। ডাক্তার ভাদুড়ীর জামাতা ডা: প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুর বাটীতে আসিয়াছিলেন।

বেচারাম (আচার্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায়) -- আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। জন্ম কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল বেহালাতে। সংস্কৃত পণ্ডিত। হাওড়ায় একটি স্কুলের শিক্ষক পরবর্তী কালে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল বেণীমাধব পালের সিঁথির বাগানবাড়িতে ব্রাহ্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন ও তাঁহার ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণে আনন্দিত হন।

বেণীমাধব পাল -- ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, ব্যবসায়ী। কলিকতার উপকণ্ঠে সিঁথিতে তাঁহার উদ্যানবাটিতে শরৎকালে এবং বসন্তকালে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধিকবার এই উৎসবে আসিয়া ব্রাহ্মভক্তদের আনন্দ দান করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি মধ্যে মধ্যে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গাদি শুনিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার উৎসবে ও ভক্তসেবায় অর্থের সদ্ব্যবহার দেখিয়া প্রশংসা করিতেন।

বেনোয়ারী কীর্তনীয়া -- শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক কীর্তনীয়া। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রথযাত্রার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বলরাম বসু তাঁর বাড়িতে বেনোয়ারীর কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঠাকুর সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন।

বৈকুণ্ঠ সান্যাল (১৮৫৭ - ১৯৩৭) -- ঠাকুরের গৃহীভক্ত। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত" নামক তথ্যবহুল গ্রন্থের প্রণেতা। নদীয়া জেলার বেলপুকুর গ্রামে জন্ম। পিতা দীননাথ সান্যাল। অনি অল্প বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইবার পর হইতেই ইষ্ট দর্শন লাভের বাসনা হয়। অতঃপর কল্পতরু দিবসে ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। আজীবন তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শের ঘনিষ্ঠ ও উৎসাহী অনুগামী ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহযোগীও ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের তিনি নানাভাবে সহায়তা করিতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের হিসাব নিরীক্ষক রূপে বহুদিন কাজ করেন। স্বামী কৃপানন্দ নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি কিছুকাল উত্তরাখণ্ডে পরিব্রাজক রূপে ভ্রমণ ও তপস্যাদি করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ সেন -- কলিকাতার মাতাঘষা পল্লীর অধিবাসী। ব্রাহ্মভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী জয়গোপাল সেনের

ভ্রাতা। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। গৃহস্থাশ্রম প্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে অতি সুন্দর উপদেশাদি দিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ -- হাইকোর্টের উকিল। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্রের আত্মীয়। ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন এবং তাঁহার সঙ্গে বহুক্ষণ ভগবৎ বিষয়ক আলোচনা করেন। বৈদ্যনাথের সঙ্গে আলোচনায় ঠাকুর প্রীত হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ -- প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। বলরাম বসু, অধরলাল সেন প্রভৃতি অনুরাগীদের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকবার বৈষ্ণবচরণের কণ্ঠে কীর্তনগান শোনেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে অধর সেন প্রতিদিন তাঁহার নিকট কীর্তন শুনিতেন। বৈষ্ণবচরণের মুখে ঠাকুর এই বিশেষ গানটি শুনিতে ভালবাসিতেন -- "দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার, দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে রে নিস্তার।" বৈষ্ণবচরণের গানে ঠাকুরের ভাবসমাধি হইত এবং ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি নৃত্যও করিতেন। বৈষ্ণবচরণ শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষ ভক্তি করিতেন।

বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী -- উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগিশের পুত্র। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধক। কলিকাতার পণ্ডিত সমাজে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পানিহাটীর চিঁড়া মহোৎসবে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তখন হইতেই ঠাকুর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং পরবর্তী কালে সর্বসমক্ষে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতাররূপে ঘোষণা করেন। একবার ঠাকুর ভাবসমাহিত অবস্থায় বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধে আরোহণ করেন। বৈষ্ণবচরণ ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনা করিতে থাকেন। বৈষ্ণবচরণ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। একবার তিনি ঠাকুরকে কাছিবাগানের তাঁহার কর্তাভজা সমাজে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রণেই ঠাকুর কলুটোলার হরিসভাতে গিয়া কীর্তনে যোগ দেন এবং ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের আসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন।

বৃন্দে -- পরিচারিকা -- প্রকৃত নাম বৃন্দা দাসী। শ্রীরামকৃষ্ণ 'বৃন্দে' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সেবা করিয়াছিলেন।

ভগবতী দাসী -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা রানী রাসমণির বাড়ীর পুরাতন দাসী। কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শন এবং সাধু-বৈষ্ণবসেবা প্রভৃতি নানা সৎকাজ করিয়াছিল। প্রায়ই সে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত। প্রথম জীবনে তাহার স্বভাব ভাল ছিল না -- কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাহার পরিবর্তন হয়।

ভগবান দাস -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক ব্রাহ্মভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁহার যাতায়াত ছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের কথা কথামৃতে উল্লিখিত আছে। ওই দিন ঠাকুর তাঁহাকে আধুনিক ধর্ম ও সনাতন ধর্ম যথাক্রমে স্বল্পকাল ও অনন্তকাল স্থায়ীত্বের কথা বলিয়াছিলেন।

ভগবান দাস বাবাজী -- বর্ধমান জেলার কালনার প্রবীন ও সিদ্ধ বৈষ্ণব। তাঁহার তাগ, শান্ত স্বভাব এবং ভগবৎ প্রেমের কথা সুবিদিত। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। একই অবস্থায় দিনরাত বসিয়া জপ করার ফলে তাঁহার পদদ্বয় পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার কলুটোলা হরিসভায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শুনিতে শুনিতে ভাবাবস্থায় শ্রীচৈতন্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা লোক পরম্পরায় জানিয়া ভগবান দাস বাবাজী তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁহার আশ্রমে সর্বাঙ্গ-বস্ত্রাবৃত হইয়া

আগমন করেন, তখন ভগবান দাস অনুভব করেন যে, কোন মহাপুরুষ তাঁহার আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। বাবাজীকে সর্বদা জপের মালা ঘুরাইতে দেখিয়া ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় তাঁহাকে প্রশ্ন করেন যে সিদ্ধ অবস্থার পরেও তিনি কেন সর্বদা মালা জপ করেন। তখন তিনি জবাব বেন যে, লোকশিক্ষার জন্য তিনি তা করেন। ঠাকুর ভাবস্থ অবস্থায় তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার অহংকার চূর্ণ করেন। শেষ পর্যন্ত বাবাজী শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন এবং স্বীকার করেন যে, তিনিই (ঠাকুরই) কলুটোলা হরিসভার শ্রীচৈতন্য আসনে আরূঢ় হওয়ার উপযুক্ত অধিকারী।

ভগবান রুদ্র -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলিকাতার এম ডি পাশ চিকিৎসক। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর চিকিৎসা উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার যোগাযোগ হয়। চিকিৎসাকালীন ঠাকুরের অবস্থা দেখিবার উদ্দেশ্যে, ঠাকুরের হাতের উপর একটি রৌপ্য মুদ্রা রাখিয়া তাঁহার সামনে পরীক্ষা করা হয়। হাতে টাকা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের হাতটি বাঁকিয়া গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। টাকাটি স্থানান্তরিত করিবার পর ঠাকুরের তিনবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে এবং হাতটিও স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনায় বিজ্ঞানজগতের মানুষ ডাক্তার অতীব বিস্মিত হন এবং ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

ভগী তেলি -- কামারপুকুর অঞ্চলের শূদ্রজাতীয়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধিকা ভগবতী দাসী। দুষ্টলোকের চক্রান্তে তিনি সাধনপথ হইতে বিচ্যুতা হইয়াছিলেন।

ভবনাথ [ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়] (১৮৬৩ - ১৮৯৬) -- ঠাকুরের গৃহীভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বরাহনগরে বর্তমান অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেনে জন্ম। পিতা রামদাস ও মাতা ইচ্ছাময়ী দেবী। পিতামাতার একমাত্র সন্তান ভবনাথ যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নানা জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত, নরেন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব, শিক্ষকতা করা এবং সর্বোপরি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ তাঁহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অন্তরিকতা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে 'হরিহরাত্মা' বলিতেন। ইহা ব্যতীত ঠাকুর কখনও নরেনকে 'পুরুষ' ও ভবনাথকে 'প্রকৃতি' বলিতেন। তিনি উভয়কেই 'নিত্যসিদ্ধ' ও 'অরূপের ঘর' বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর বরাহনগরে মঠের জন্য মুন্সীদের ভূতুড়ে বাড়ি মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায় ভবনাথ যোগাড় করিয়া দেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন, বহুবার ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিলেন। 'নীতিকুসুম' ও 'আদর্শনারী' তাঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ। তাঁহারই আহ্বানে বরাহনগরের অবিনাশ দাঁ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার ক্যামেরায় ৺বিষ্ণু মন্দিরের দালানে সমাধিস্থ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুল প্রচারিত ছবি তোলেন। তিনি ঠাকুরকে ধ্রুবর একটি ফটো উপহার দিয়াছিলেন, যেটি বর্তমানে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুরের ঘরের শোভাবর্ধন করিতেছে। বরাহনগরমঠ প্রতিষ্ঠার সময় আর্থিক সাহায্য না করিলেও অন্য দিক দিয়া তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরে বিদ্যালয় পরিদর্শনের চাকুরী লইয়া কলিকতার বাহিরে চলিয়া যান, ফলে বরাহনগর মঠের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ক্ষীণ হইতে থাকে। তিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে বিহারী ডাক্তার রোডে বসবাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রতিভার জন্ম হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি রামকৃষ্ণ দাস লেনের ভাড়াবাড়িতে দেহত্যাগ করেন।

ভাস্করানন্দ স্বামী (১৮৩৩ - ১৮৯৯) -- কাশীর সিদ্ধ সন্ন্যাসী, প্রকৃত নাম মতিরাম। মণিলাল মল্লিক শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁহার কথা বলিয়াছিলেন। কানপুর জেলার মিথিলাপুর গ্রামে জন্ম। ব্যাকরণ ও বেদান্তাদি শিক্ষার পর ২৭ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। সেখানে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে দর্শন করিয়া এই নির্বিকার পুরুষ সম্বন্ধে স্বীয় উচ্চ ধারণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামীজীও পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও এই ত্যাগী ও নিরহঙ্কার পুরুষের প্রসঙ্গ উল্লেখ

করিয়াছিলেন।

ভূধর চট্টোপাধ্যায় -- কলিকাতার পটলডাঙা নিবাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন। তাঁহার কলিকাতার বাড়িতে শশধর কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূধরের যোগাযোগ হয়। ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রণীত 'সাধুদর্শন' নামক পুস্তকে (১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৯২৪ সাল) রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একটি নিবন্ধ আছে। তাঁহার শেষজীবন কাশীতে অতিবাহিত হয়।

ভুবনমোহিনী ধাত্রী -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, কলিকাতার জনৈকা ধাত্রী এবং মহিলা ভক্ত। ইনি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন।

ভুবনেশ্বরীদেবী (ভুবনেশ্বরী দত্ত -- নরেন্দ্রনাথের মাতা) -- অতীব ধর্মপরায়ণা, দয়ালু, পরোপকারী মহিলা। তিনি স্বল্প-শিক্ষিতা কিন্তু অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা এবং মাত্র ১১ বছর বয়সে বিশ্বনাথ দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত সংসারে বিশাল দায়িত্ব পরিচালনা করিতেন। প্রতিদিন রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিতেন যাহার অধিকাংশই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহা ছাড়া দরিদ্র সেবা, বহু কর্তব্যকর্মের মধ্যেও শান্ত সমাহিত চিত্তে ভগবানের সাধনা করা ছিল তাঁহার কাজ। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার খুব দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে কিন্তু তিনি কখনো ভাঙিয়া পড়েন নাই। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তিনি পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেন। নরেন্দ্রনাথের অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে তঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী জাগাইয়া তোলেন। রামায়ণ, মহাভারত পাঠের দ্বারা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য গৌরবকে নরেনের চোখের সামনে তুলিয়া ধরেন। মানুষের প্রতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভালবাসা, যা নরেনকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল তাহার শিক্ষাও তিনি মাতা ভুবনেশ্বরীদেবীর নিকট হইতে পান। তাঁহার জীবনে মাতার প্রভাব পরবর্তী কালে তিনি বহুবার স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরে ঠাকুরের অসুখের সময় ঠাকুরের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। পুত্রের অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া মাতা ছয় বৎসরের বালক পুত্র ভূপেনন্দ্রনাথকে লইয়া তাঁহার সন্ধানে কাশীপুরে আসেন। ভুবনেশ্বরী কাঁকুড়গাছি বাগানবাড়িতে ঠাকুরের পূতাস্থির সমাধিস্থ দিবসে উপস্থিত ছিলেন ও পরবর্তী কালে এই দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

ভূপতি -- কলিকাতার রাজবল্লভ পাড়ায় জন্ম। বলরাম-মন্দিরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহার উচ্চ অনুভূতি হয়। পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ বারাসতের হৃদয়পুরের কোঁড়া অঞ্চলে 'ঋষভ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় -- আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা। নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী -- যশোহর জেলার বিদুষী ব্রাহ্মণ কন্যা -- প্রকৃত নাম যোগেশ্বরী। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের তন্ত্রসাধনার গুরু। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আনুমানিক ৪০ বৎসর বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইনি চৌষট্টি প্রকার তন্ত্রসাধনা করান এবং ঠাকুরকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঠাকুরের সহিত কামারপুকুরে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাও যোগেশ্বরীকে শ্বশ্রূমাতার মতোই সেবা করিতেন। কামারপুকুর হইতে তিনি কাশী গমন করেন এবং শেষ জীবন কাশী ও বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় -- দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির মুহুরী এবং পরে খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন। ইনি ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাকে মাঝে মাঝে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

মথুরনাথ বিশ্বাস (মথুরামোহন বিশ্বাস -- সেজোবাবু) -- মথুরামোহন রানী রাসমণির তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর স্বামী। তিনি রানীর সেজো জামাতা বলিয়া 'সেজোবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। করুণাময়ীর মৃত্যুর পর রানীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত, শিষ্য, সেবক ও রসদদার ছিলেন। দীর্ঘ ১৮ বৎসর তিনি ঠাকুরের অসাধারণ সেবা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের উপর ছিল তাঁহার অচল বিশ্বাস ও অগাধ বিশ্বাস ও অগাধ ভক্তি। মথুরামোহনই ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীর পূজক পদে নির্বচন করিয়াছিলেন। তিনি নানারকম যুক্তি, পরীক্ষা দ্বারা ঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন, অবশেষে ঠাকুরের ন্যায় প্রকৃত কাম-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর পায়ে আত্মনিবেদন করেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে একসঙ্গে শিব ও কালীমূর্তি দর্শন করেন। তিনি ঠাকুরকে জীবন সর্বস্ব রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সকল বিষয়েই তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। ঠাকুরের পক্ষে দক্ষিণেশ্বরে -- সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্বরকমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার ক্ষেত্রে মথুরের ঐকান্তিক সেবা অপরিহার্য ছিল। ঠাকুরকে তিনি নানা তীর্থদর্শন করাইয়াছিলেন। ঠাকুরের সাধনকালে সাধনার যাবতীয় সেবার ভার তিনি গ্রহণ করায় ঠাকুর তাঁহাকে ৺জগদম্বার লীলায় প্রধান রসদদার বলিয়া জানিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মথুরবাবুর অলৌকিক সম্বন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার এক বিশেষ অধ্যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

মধুসূদন ডাক্তার -- ঠাকুরের হাত ভাঙার সময় ইনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে যাত্রাগান শুনিতে গিয়া ঠাকুর ইঁহার চোখে অশ্রুর ধারা দেখিয়াছিলেন। তাঁহার অধিক বয়সে শক্তিসামর্থ্যের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩) -- বাংলা নবজাগরণের এক নবীন প্রতিভা। খ্রীষ্টান ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যান ও ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ভারতে আসেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করিলেও ব্যয়াধিক্যের ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন ও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া উত্তরপাড়ায় চলিয়া যান। ১৮৫৯ - ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ ছিল মধুসূদনের জীবনের সর্বোত্তম কয়েকটি বছর। এই সময় তাঁহার তিনটি নাটক, দুইটি ব্যঙ্গ নাটক ও চারটি কাব্য প্রকাথিত হয়। তাঁহার 'মেঘনাদ বধ' কাব্য বাংলা কাব্যে নবজাগরণের সূচনা করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অত্যুত্তম রচনাসমূহ পাঠে তাঁহার উৎসাহ ছিল। তিনি সমাজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আধুনিক চিন্তাধারা আনিতে চাহিয়াছিলেন। মধুসূদন দত্ত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের বাগান সংক্রান্ত একটি মামলা পরিচালনা করিতেছিলেন। সেই সময় মথুরামোহনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারিকানাথের সহিত সেই ব্যাপারে আলোচনা করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তখন দ্বারিকাবাবু তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করান। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঠাকুর তাঁহার সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি মাইকেলকে দুইখানি রামপ্রসাদী গান গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।

মণি মল্লিক (মণিমোহন মল্লিক -- মণিলাল মল্লিক) -- সিঁদুরিয়াপটী নিবাসী ব্রাহ্মভক্ত। ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ মণিমোহন মল্লিক ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত। তিনি খুব হিসাবী মানুষ ছিলেন। পরবর্তী কালে পঁচিশ হাজার টাকা দরিদ্র বালকদের ভরণপোষণার্থে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি যুবক পুত্র মারা গেলে তিনি শোকার্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং ঠাকুরের কথামৃত ও ভজন গান শুনিয়া তাঁহার শোকের লাঘব হয়। তখন তিনি বলেন, তিনি জানিতেন যে ঠাকুর ছাড়া তাঁহার শোকের আগুন আর কেহ নির্বাপিত করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্ম

সমাজের বাৎসরিক উৎসবে মণিমল্লিক ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ করেন। ঠাকুর তাঁহার গৃহে প্রায়শঃ যাইতেন, ভাবে নৃত্যগীতাদি করিতেন এবং কখনো সমাধিস্থ হইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিতেন।

মণী সেন (মণিমোহন সেন) -- পাণিহাটির মণিমোহন সেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তিনি কখনো একা, কখনো সঙ্গীর সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিতেন। মথুরবাবুর মৃত্যুর পর তিনি স্ব-ইচ্ছায় ঠাকুরের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্ভবতঃ দেশিদিন তিনি এই দায়িত্ব বহন করেন নাই। মণিমোহন পাণিহাটির ৺রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন। পাণিহাটির বিখ্যাত চিঁড়া মহোৎসবে মণিমোহনের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর ভক্তদিগের সহিত গিয়াছিলেন। প্রথমে মণি সেনের গৃহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মন্দিরে যান। অতঃপর ভাবাবেশে গলার ব্যাথা ভুলিয়া মণি সেনের গুরু নবদ্বীপ গোস্বামীর সহিত কীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া সমাধিস্থ হইতে থাকেন। তখন তাঁহাকে লোকে সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মনে করিয়া তাঁহার চারিদিকে সকলে আনন্দে কীর্তন ও নৃত্য করিতেছিল। পরে মণি সেনের গৃহে জলপান করিয়া তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে রওনা হন। মণি সেন সকলকে দক্ষিণা দিলেও ঠাকুর কিছুতেই দক্ষিণা গ্রহণ করেন নাই।

মণীন্দ্র গুপ্ত [মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত] (১৮৭১ - ১৯৩৯) -- মণীন্দ্র (খোকা) একাদশ বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রকিশোর ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহিত আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে থাকিতেন। তারপর কলিকাতায় যখন ফিরিয়া আসিলেন ঠাকুর তখন শ্যামপুকুরে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সারদাপ্রসন্নর সহিত ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ঠাকুরকে দেখিতে যান। ঠাকুর তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং আবার আসিতে বলেন। পরদিন গেলে ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহভরে ক্রোড়ে লইয়া সমাধিস্থ হন। ইহার পর তিনি সেখানে নিত্য যাইতে থাকেন এবং ঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করেন। কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে তিনি পাখার হাওয়া করলতেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের দোলযাত্রার দিনে ঠাকুর তাঁহাকে হোলিখেলার জন্য যাইতে নির্দেশ দিলেও তিনি ঠাকুরকে একা রাখিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। ঠাকুর অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে তাঁহাকে তাঁহার সেই 'রামলালা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বিবাহ করলেও শ্রীরামকৃষ্ণদের শিষ্যদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অবিচল।

মণি সেনের সঙ্গী ডাক্তার -- শ্রীরামকৃষ্ণের যখন হাত ভাঙিয়া গিয়াছিল তখন ডা: প্রতাপ মজুমদার চিকিৎসা করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিয়াছিলেন। পাণিহাটির মণি সেন এই ডাক্তারকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি প্রতাপ মজুমদারের ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই। ইহার বুদ্ধি সম্বন্ধে ঠাকুর বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

মনোমোহন মিত্র (১৮৫১ - ১৯০৩) -- শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত। কোন্নগরের মিত্র পরিবারের সন্তান -- রামচন্দ্র দত্তের মাসতুতো ভাই। রাখাল তাঁহার ভগ্নীপতি ছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম সমাজে তাঁহার যাতায়াত ছিল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহার প্রতি ঠাকুরের কৃপা মনোমোহন মিত্রের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বান্তঃকরেণে গুরুরূপে গ্রহণের ফলে মনোমোহনের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বরাহনগর মঠে সন্ন্যাসীদের অসুস্থ অবস্থায় মনোমোহন তাঁহাদের দেখাশুনা করিতেন। তত্ত্বমঞ্জরীতে ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৯৩ - ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁহার গৃহে আসিতেন।

মনোহর সাঁই (গোস্বামী) -- প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া। দক্ষিণেশ্বরে ও অধরের বাড়িতে কয়েকবার ঠাকুরকে

কীর্তন শুনাইয়া ছিলেন। ঠাকুর তাঁহার কীর্তন খুব পছন্দ করিতেন -- মনোহরও ঠাকুরের অনুরাগীভক্ত ছিলেন।

মহলানবীশ (ডাক্তার) -- সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। সমাজ মন্দিরের নিকট তাঁহার চিকিৎসা গৃহ ছিল। একবার ঠাকুর ব্রাহ্মভক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়িতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় তখন বাড়িতে না থাকায় ডা: মহলানবীশ ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজ মন্দিরে লইয়া যান ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ঈশ্বর-প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন।

মহিমাচরণ চক্রবর্তী -- কাশীপুরনিবাসী মহিমাচরণ বেদান্ত চর্চা করিতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ধর্মীয় চিন্তায়, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে তিনি সময় কাটাইতেন। সংস্কৃত, ইংরাজীতে বহুগ্রন্থ পড়িয়া তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক গুণ ছিল। কিন্তু তিনি যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধার্মিক, উদার এবং বহুগুণের-সমাবেশ তাঁহার মধ্যে আছে -- ইহা সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন, ইহা তাঁহাকে অনেকের কাছে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিত। নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশ তাঁহার সহিত তর্ক করিতেন। একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়িতে অন্নপূর্ণা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি বিরাট গ্রন্থাগারও তাঁহার ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে ভক্তিমার্গের কথাপ্রসঙ্গে বহুবার নারদ পঞ্চরাত্রের শ্লোক আবৃত্তি করাইয়াছিলেন।

মহেন্দ্র কবিরাজ -- মহেন্দ্রনাথ পাল -- সিঁথি নিবাসী কবিরাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'সিঁথির মহিন্দোর পাল' বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম চিকিৎসক।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪ - ১৯৩২) -- ইনি 'শ্রীম' বা মাস্টার মহাশয় নামে অধিক খ্যাত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র ছিলেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিয়শনের ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী ছিলেন। তখনকার দিনের অন্যান্য সকল ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের মতো তিনিও পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে অনুরক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের আকর্ষণে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সভাতেই তিনি পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আত্মীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুপ্রেরণায় তিনি তাঁহার অপর এক আত্মীয় সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। প্রথম দর্শনই তাঁহার হৃদয়-মনকে এতদূর অভিভূত করে যে তিনি চিরজীবনের জন্য ঠাকুরের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া যান। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের গর্ব ঠাকুরের প্রভাবে ভগবন্মুখী হইয়া যায়। তিনি বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বরকে জানাই আসল জ্ঞান। ঠাকুর প্রথম দর্শনেই মহেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার কথা জানিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিরন্তর উপদেশ, অবিরাম শিক্ষা তাঁহাকে ভাগবত জীবনযাপনের শিক্ষা দিতে লাগিল। ঠাকুরের বাণী প্রচার করাই তাঁহার ভবিষ্যত জীবনের কাজ; সেজন্য তাঁহাকে ঠাকুর গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। সংসারে থাকিয়াও গৃহী-সন্ন্যাসীর জীবনযাপন, ঈশ্বরের প্রতি অসীম ভক্তি, সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা, তাঁহার শেষ জীবন অবধি তিনি করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ধ্যানে, মননে, তাঁহার সমগ্র চিন্তাকে তন্ময় করিয়া রাখিতেন সর্বদা। তাঁহার বহু ছাত্রকে তিনি ঠাকুরের কাছে লইয়া আসিয়াছেন যাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ছায়ার মতো তিনি ঘুরিতেন এবং তাঁহার আচরণ, পূর্বকথা, বাণী সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন যাহা তিনি ইংরেজী ছোট পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ করেন। ৫০ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে ৪র্থ তলের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রায় ২০ বৎসর বাস ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের পরিবেশনাই মাস্টার মহাশয়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। তিনি কথামৃত ইংরেজীতে 'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে প্রকাশ করেন যাহা পাঠ করিয়া বহু দেশী-বিদেশী মানুষ প্রভাবিত হইয়াছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণী, দেশ-দেশান্তরের মানুষকে শান্তিলাভের পথে চলিবার প্রেরণা দান

করিতেছে।

মহেন্দ্র গোস্বামী -- বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। রামচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রের প্রতিবেশী। ধর্মবিষয়ে গোঁড়ামী না থাকায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এবং উপদেশ লাভে আগ্রহী ছিলেন। রামচন্দ্র দত্তের গৃহে শুভাগমন করিলে ঠাকুরের সহিত ইনি দেখা করিতেন -- দক্ষিণেশ্বরেও কিছুকাল ঠাকুরের নিকট ছিলেন ও উদার ভাবাপন্ন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় -- শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। বাগবাজার রাজবল্লভ পাড়ার বাসিন্দা। তাঁহার একটি ময়দার কল ছিল আরও অন্যান্য ব্যবসা ছিল, ২৪ পরগণার কেদেটি গ্রামে এবং বাগবাজারে তাঁহার বাড়ি ছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে যাইবার পূর্বে এবং পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টার মহাশয়ের সহিত মহেন্দ্রের হাতিবাগানস্থিত ময়দা কলের বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুর সেখানে ভাবস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহার ভক্তি ও সেবায় খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মহেন্দ্র মঠের প্রয়োজনীয় ময়দা ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রায়ই সরবারাহ করিতেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার (ডাক্তার) (১৮৩৩ - ১৯০৪) -- হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পর মাতার সহিত মাতুলালয়ে থাকিয়া হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজে শিক্ষা। বৃত্তি লাভ করয়া মেডিকেল কলেজ হইতে এল. এম. এস পরে এম. ডি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এলোপ্যাথি ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন। শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সম্মানসূচক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় (২১০ নং বহুবাজার স্ট্রীটে) ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (বর্তমানে যাদবপুর নূতন ভবনে স্থানান্তরিত) স্থাপন করেন। মথুরবাবুদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন -- সেইসূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে শ্যামপুকুরে ডাকা হয়। ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন চিকিৎসাসূত্রে তিনি প্রায় প্রতিদিন ঠাকুরের নিকট আসিতেন এবং প্রাণ ভরিয়া ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গ করিয়া যাইতেন। প্রথম দিনের পর তিনি প্রাপ্য দর্শনীও নিতেন না। ক্রমে ঠাকুরের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে এবং মানসিক শান্তি লাভ করেন। তিনি একদা জনৈক ডাক্তার বন্ধুর সহিত একত্রে সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের শরীর পরীক্ষা করিয়া তাঁহাতে নিস্পন্দভাব লক্ষ্য করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হন। মহেন্দ্র বলেন, As a man I have the greatest regard for him. ঠাকুরের চিকিৎসা করিতে আসিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন।

মানময়ী -- শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্তের শিশুকন্যা। শ্রীশ্রীঠাকুর পুত্রশোকগ্রস্তা শ্রীম'র সহধর্মিণীকে এই শিশুকন্যাসহ কাশীপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট থাকিতে বলেন। শ্রীশ্রীমা কন্যাটিকে স্নেহভরে 'মানময়ী' বলিয়া ডাকিতেন।

মারোয়াড়ী ভক্ত -- কলিকাতার বড়বাজারের ১২ নং মল্লিক স্ট্রীট নিবাসী জনৈক মারোয়াড়ী ভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তিনি প্রায়ই যাইতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর, সোমবার 'অন্নকূট' উপলক্ষে ঠাকুর তাঁহার মল্লিকবাজারের বাড়িতে আমন্ত্রিত হইয়া যান। মারোয়াড়ী ভক্তগণ ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করেন। ঠাকুর সেখানে তাঁহাদের সহিত সহজবোধ্য হিন্দীতে ভগবৎ প্রসঙ্গ করেন এবং শ্রীশ্রীময়ূর মুকুটধারী বিগ্রহের পূজা দর্শন করিয়া তিনি ভাবসমাধিস্থ হন ও শ্রীবিগ্রহকে চামর ব্যজন করেন। তিনি এই ভাগ্যবান ভক্তের বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মাস্টারের পরিবার (নিকুঞ্জ দেবী) -- শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহধর্মিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমার

স্নেহধন্যা মহিলাভক্ত। নিকুঞ্জ দেবী পুত্র শোকে অত্যধিক কাতর হইয়া মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিলে মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট লইয়া আসেন এবং পরে কাশীপুরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বাস করিয়া তাঁহার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি শ্রীশ্রীমার সহিত বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছিল।

মিশ্র সাহেব (প্রভুদয়াল মিশ্র) -- উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। এক ভ্রাতার বিবাহের দিনে সেই ভ্রাতা এবং আর এক ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া খ্রীষ্টান হন। কিন্তু তাঁহার সাহেবী পোষাকের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিত গৈরিক বস্ত্র। তিনি কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদর্শন পূর্বেই পাইয়াছিলেন। ৩৫ বৎসর বয়সে ঠাকুরের সন্ধান পাইয়া তিনি শ্যামপুকুরের ভাড়া বাড়িতে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। ভাবস্থ ঠাকুরের মধ্যে তিনি যীশুর প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হন।

মোহিত সেন (মোহিতচন্দ্র সেন) -- জয়কৃষ্ণ সেনের পুত্র। তিনি হেয়ার স্কুল, মেট্রোপলিটন কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করিয়াছেন। তিনি কেশব সেনের নব ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। মোহিত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তাঁহার ধর্মবিষয়ে গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি এম. এ. পরীক্ষায় দর্শনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং নানা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারে সম্পূর্ণ রপে আত্মনিয়োগ করেন। সিস্টার নিবেদিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁহার জ্ঞানের প্রশংসা করেন।

যোগীন্দ্র [যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী -- স্বামী যোগানন্দ] (১৮৬১ - ১৮৯৯) -- দক্ষিণেশ্বরের প্রসিদ্ধ সাবর্ণ চৌধুরীর বংশে জন্ম। পিতা নবীনচন্দ্র নিষ্ঠবান ব্রাহ্মণ। দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। যোগীনদ্রনাথও প্রথম দর্শনে তাঁহাকে কালীবাড়ির বাগানের মালী মনে করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু প্রথম দিনেই যোগীন্দ্রকে 'ঈশ্বরকোটী' বলিয়া চিনিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে একদা নিরঞ্জনানন্দ বলিয়াছিলেন -- "যোগীন আমাদের মাথার মণি।" কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাদি পড়িয়া যোগীন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে উৎসুক হইয়াছিলেন। প্রথম পরিচয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "মহদ্বংশে জন্ম -- তোমার লক্ষণ বেশ সব আছে। বেশ আধার -- খুব (ভগবদ্ভক্তি) হবে।" তদবধি যোগীন ঘন ঘন ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। পরে চাকুরির চেষ্টায় থাকাকালীন নিতান্ত অনিচ্ছায় বিশেষতঃ মাতার বিশেষ পীড়াপীড়িতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এইজন্য অপরাধীর মতো ঠাকুরের কাছে গেলে তাঁহাকে অভয় দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এখানকার কৃপা থাকিলে লাখটা বিবাহ করিলেও ক্ষতি নাই। সাংসারিক দৃষ্টিতে অনভিজ্ঞ যোগীন্দ্রনাথকে ঠাকুর নানারকম শিক্ষার দ্বারা উপযুক্ত করিয়া তোলেন। তাই তাঁহাকে একসময়ে বলিয়াছিলেন -- ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন? কাশীপুরে তিনি প্রাণপণে ঠাকুরের পরিচর্যা করেন। ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। এরপরে প্রায় সবসময়ে শ্রীমায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। মধ্যে কয়েকবার তীর্থভ্রমণে যান। অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রের ফলে ক্রমাগত পেটের অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বেলুড় মঠের জমি ক্রয়ের ব্যাপারে তাঁহার অবদান উল্লখযোগ্য।

যোগীন্দ্র বসু (১৮৫৪ - ১৯০৫) -- বর্ধমান জেলার ইলসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাধবচন্দ্র। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অধর সেনের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথাম সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশত তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর যাইতেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ -- কালাচাঁদ, কৌতুককণা, নেড়া হরিদাস ইত্যাদি।

যোগীন্দ্র সেন -- কৃষ্ণনগরের অধিবাসী, কলিকতায় সরকারী চাকুরী করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সরল ও অমায়িক গৃহীভক্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমনের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। বৈকুণ্ঠ সান্যাল রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থে যোগীন্দ্রকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপার কথা উল্লিখিত আছে। ১৩২০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

যজ্ঞনাথ মিত্র -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত এবং কলিকাতার নন্দন বাগানের ব্রাহ্মনেতা কাশীশ্বর মিত্রের পুত্র। নিজেদের বাড়ি ছাড়াও তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। পিতার মৃত্যুর পরেও যজ্ঞনাথ তাঁহাদের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন।

যতীন দেব -- কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রপৌত্র যতীন শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত। তিনি ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে খুব যাতায়াত ছিল।

যতীন্দ্র [যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর] (১৮৩১ - ১৯০৮) -- কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিবার, দানবীর ও 'মহারাজা' উপাধিপ্রাপ্ত বিদ্যোৎসাহী পুরুষ। তিনি "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে"র সম্পাদক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। হিন্দুধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়িতে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 'কর্তব্য কি?' ঠাকুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে যতীন্দ্র সংসারীদের মুক্তির বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের কথা উল্লখ করিয়াছিলেন। তাহাতে ঠাকুর বিরক্ত হইয়া তাহার সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন। পরে ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সহিত ঠাকুর সৌরেন্দ্রমোহনের বাড়িতে গিয়া যতীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন খবর পাইয়া অসুস্থতার সংবাদ পাঠাইয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন নাই।

যদুলাল মল্লিক (১৮৪৪ - ১৮৯৪) -- কলিকতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী মতিলাল মল্লিকের দত্তক পুত্র; ধনী, বাগ্মী ও ভগবদ্‌ভক্ত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সহিত এন্ট্রান্স পাশ করিয়া বি. এ. পর্যন্ত পড়েন। কিছুদিন আইন পড়িয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসোয়েশনের সদস্য হিসাবে অনারারি ম্যজিস্ট্রেটরূপে এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার প্রভৃতি পদে থাকাকালীন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারী কর্মচারীদের কঠোর সমালোচনার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যর হেনরি হ্যারিসন তাঁহাকে 'দি ফাইটিং কক্' নাম দিয়াছিলেন। দানশীল এবং শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উদার ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে যদুবাবুর পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে গিয়া নিত্যসেবিতা ৺সিংহবাহিনীকে দর্শন করিয়া সমাধিস্থ হন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির দক্ষিণে গঙ্গাতীরে যদুবাবুর ত্রিতল বাড়ির কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলকে বিক্রয় করেন। বর্তমানে মহামণ্ডল পরিচালিত আন্তর্জাতিক অতিথিভবন এবং ঠাকুরের মর্মরমূর্তি সমন্বিত মন্দির সেই স্থলে অবস্থিত। ওই উদ্যানবাটিতে একটি ঘরের দেয়ালে মাতা মেরীর কোলে বালক যীশুর চিত্র দর্শন করিয়া তিনি খ্রীষ্টীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং ক্রমাগত তিনদিন ওই ভাবে আবিষ্ট থাকিয়া পঞ্চবটীতে যীশুর দিব্যদর্শন লাভ করেন। এই বৈঠকখানা ঘরেই ঠাকুর একদা ভাবাবস্থায় নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিলে নরেন্দ্রের বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পায় এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ও এই বিষয়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ লীলা সহায়ক বলিয়া সমূহ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার যদুবাবুর এই বৈঠকখানায় ও তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে গিয়া তাঁহাদের পরিবারকে ধন্য করিয়াছিলেন।

রজনীনাথ রায় (১৮৪৯ - ১৯০২) উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। জন্ম-অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত ঢাকাতে।

হিন্দু, তবে পরবর্তী কালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করন এবং "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত লাভ করেন। বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার ভূমিকা অন্যতম। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত মণিলাল মল্লিকের কলিকতার সিঁদুরিয়াপটির বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল। রজনীনাথ রায় সেই উৎসবস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন এবং তাঁহার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গাদি শ্রবণ করেন।

রতন -- শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে তত্ত্বাবধায়ক -- এই সূত্রেই তিনি ঠাকুরের পূতসঙ্গলাভের সুযোগ পান। ভক্ত যদুলালের বাড়িতে যাত্রা-গান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঠাকুরকে আমন্ত্রণের জন্য রতন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। ঠাকুর রতনকে খুবই স্নেহ করিতেন।

রতির মা -- শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গোঁড়া বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবচরণ দাসের শিষ্যা। পাইকপাড়ার রাজা লালাবাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী দেবীর ঘনিষ্ঠ সহচরী, অতি শুদ্ধাচারে জীবনযাপন করিতেন। মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন। ঠাকুর মা ভবতারিণীকে একবার 'রতির মার বেশে' ভাবচক্ষে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়ামি ছিল। সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বন্ধ করেন।

রবীন্দ্র -- কলিকাতা নিবাসী বৈষ্ণববংশজাত ভক্তিমান যুবক। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় কিছু লিখিয়া দিয়াছিলেন। একবার বৃষকেতু নাটক দেখিয়া ফিরিবার সময় তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া তিনদিন নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইত। পরে বরাহনগর মঠেও তাঁহার যাতায়াত ছিল। কিন্তু সেইসময় তিনি অসৎ সঙ্গে মনের ভারসাম্য কিছুটা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) -- বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। জন্মকলিকতারা জোড়াসাঁকো অঞ্চলে। ধনীর সন্তান। সেইসময়কালে প্রগতিশীল পরিবার বলিতে এই ঠাকুর পরিবারকে বুঝাইত। অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই অন্য সকলের অপেক্ষা একটু আলাদা ধরণের ছিলেন। একাধারে গায়ক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ছিলেন। স্কুল-কলেজের তথাকথিত ডিগ্রী তাঁহার না থাকিলেও, রবীন্দ্রনাথের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি বিরল। জালিয়ানোয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯১৩ সালে ভারতবাসী হিসাবে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে কখনও শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন তিনি পান। নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সেখানে রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুর বাড়ির অনেকেই উপস্থিত থাকিয়া গান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে কলিকাতায় যে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন আহূত হয় তাহার পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে খুব সুন্দর মন্তব্য করেন। এই উপলক্ষে The Cultural Heritage of India নামে যে স্মারক গ্রন্থ বাহির হয় তাহার ভূমিকাতে The Spirit of India নামে এক বাণী দেন।

রসিক মেথর -- দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ঝাড়ুদার। শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত পরমভক্ত। রসিক শ্রীরামকৃষ্ণকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব রসিককে স্নেহভরে "রসকে" বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার দুই বৎসরের মধ্যেই রসিকের জীবনাবসান ঘটে। জীবনাবসানের অন্তিম মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন এবং "এই যে বাবা এসেছ, বাবা এসেছ" বলিয়া সজ্ঞানে "রামকৃষ্ণ" নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

ঠাকুরের পরমভক্ত রসিক মেথর রামকৃষ্ণভক্ত-মণ্ডলীতে বিশেষ স্থানাদিকারী হিসাবে গণ্য।

রাখাল [রাখালচন্দ্র ঘোষ -- স্বামী ব্রহ্মানন্দ] (১৮৬৩ - ১৯২২) -- রাখালচন্দ্র ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা-কুলীন গ্রামে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আনন্দমোহন ঘোষ। তিনি সঙ্গতিপন্ন জমিদার ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে রাখালচন্দ্রের মাতা কৈলাসকামিনীর দেহত্যাগ হইলে তিনি বিমাতা হেমাঙ্গিনীর স্নেহময় ক্রোড়ে মানুষ হইতে থাকেন। উপযুক্ত বয়সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য বাটীর নিকটে একটি বিদ্যালয়ে স্থাপনপূর্বক আনন্দমোহন উহাতে রাখলচন্দ্রকে ভর্তি করিয়া দিলে তথায় বালকের সৌম্য সুন্দর আকৃতি ও মাধুর্যময় কোমল প্রকৃতির ছাত্র ও শিক্ষককে আকৃষ্ট করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়েও রাখালের বিশেষ উৎসাহ ছিল। ক্রীড়াদিতে যেমন তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না, কুস্তিতেও তেমনি কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিত না। বাল্যকাললেই গ্রামের উপকণ্ঠে ৺কালীমন্দিরের নিকটে বোধনতলায় স্বনির্মিত শ্যামামূর্তির পূজাদিতে মগ্ন থাকিতেন। আবার তাঁহাদের বাটীতে প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজার সময়ে পূজামণ্ডপে পুরোহিতের পশ্চাতে বসিয়া পূজা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং সন্ধ্যাকালে অনিমেষনয়নে মায়ের আরাত্রিক দর্শন করিতে করিতে নিজেকে কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে হারাইয়া ফেলিতেন। সংগীতে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল -- সঙ্গীদের লইয়া শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এত তন্ময় হইতেন যে দেশ-কালের জ্ঞান লোপ পাইত। বৈষ্ণব ভিখারির মুখে বৃন্দাবনের মুরলীধর রাখালরাজের গান শুনিয়া অত্মহারা হইতেন। ১২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় বিমাতার পিতৃগৃহে থাকিয়া নিকটস্থ "ট্রেনিং একাডেমিতে" পড়াশুনা করিতে থাকেন। এইখানেই নরেন্দ্রনাথের (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্যের উদয় হয়। নরেন্দ্রের প্রেরণাতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন বলিয়া সমাজের অঙ্গীকার পত্রে সাক্ষর দেন।

রাখলচন্দ্রের পিতা পুত্রের ধর্মভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য কোন্নগর নিবাসী ভুবনমোহন মিত্রের কন্যা এবং মনোমোহন মিত্রের ভগিনী একাদশ বর্ষীয়া বিশ্বেশ্বরীর সহিত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ দেন। ঠাকুরের নিকট আসিবার পূর্বে ঠাকুর ভাব-নেত্রে তাঁহার মানসপুত্রের দর্শন পান। তাই মনোমোহনবাবু রাখলকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলে ঠাকুর তাঁহার মানসপুত্রকে পাইয়া তাহাকে সন্তানের ন্যায় গ্রহণ করেন। তাঁহারই কৃপায় রাখাল পিতার বাধা এবং স্ত্রীর মায়ামমতা সহজেই কাটাইয়া উঠিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হন। নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরে ঠাকুরের মুখে রাখালের "রাজবুদ্ধির" প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিতে সকলকে বলেন। এবং সেইহেতু পরবর্তী কালে তাঁহার রাজামহারাজ নামের প্রচলন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ নাম ধারণ করেন এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। ১/৫/১৮৯৭ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হইলে মিশনের কলিকাতা শাখার সভাপতি হন। কিছুকাল পরেই স্বামীজী তাঁহাকে সঙ্ঘের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ পূর্বক মঠ ও মিশনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ভারতের প্রায় সর্বত্র গমন করিয়া বহু নূতন শাখা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাঙ্গালোর আশ্রমের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদঘাটন, মাদাজ রামকৃষ্ণ মঠের মিশন ছাত্রাবাসের ও ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভুবনেশ্বরে রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই। বাঙ্গালোরে "শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম" সংকীর্তনটি শুনিয়া সপ্তকাণ্ডাত্মক এই নাম-রামায়ণ সংকলন করিয়া মঠের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচলন করেন, ইহা সর্বসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল, সোমবার রাত্রি পৌনে নয়টায় বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল মহাসমাধিতে মগ্ন হন।

রাখাল ডাক্তার [রাখালদাস ঘোষ] (১৮৫১ - ১৯০২) -- শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কলিকতার কলেজ স্ট্রীট নিবাসী খ্যাতনামা চিকিৎসক। জন্ম কলিকতার নিকট বালীতে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। হিল্‌টন

কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিতা। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট চিকিৎসা উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ হয়। দোহারা চেহারার রাখাল ডাক্তারের হাতের আঙ্গুলগুলি মোটা ছিল। সেইজন্য যখন ঠাকুরের গলার ভিতর হাত দিয়া রাখাল ডাক্তার পরীক্ষা করিতেন তখন ঠাকুর খুবই সন্ত্রস্ত হইতেন। রাখাল ডাক্তার প্রায়ই ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিলে আপ্যায়ন করিতেন।

রাখাল হালদার -- শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ডাক্তার। নিবাস কলিকাতার বহুবাজারে। ঠাকুরের অন্যতম চিকিৎসক। রাখাল হালদার মাঝে মাঝেই কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুর নানাবিধ উপদেশ দানে তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

রাখালের বাপ (আনন্দমোহন ঘোষ) -- রাখালচন্দ্র ঘোষের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) পিতা সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদার। পাঁচ বৎসর বয়সে রাখালের মাতা কৈলাসকামিনীর দেহত্যাগ হয়। অতঃপর রাখালের পিতা দ্বিতীয়বার হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

রাখালের বাপের শ্বশুর (শ্যামলাল সেন) -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দের মাতামহ সম্পর্কীয়। রাখালচন্দ্রের পিতা আনন্দমোহন ঘোষ, রাখালের মাতার মৃত্যুর পর ইঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি সাধক ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়া তিনি জামাতা আনন্দমোহনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও ঈশ্বর লাভের উপায় সম্পর্কে ঠাকুর তাঁহাদের উপদেশ দান করেন।

রাজনারায়ণ -- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে চণ্ডীর গান শুনাইয়া তুষ্ট করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্রসহ তিনি গান করিতেন।

রাজমোহন -- শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত। নিবাস কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লী। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতি তরুণেরা প্রায়ই তাঁহার বাড়িতে যাইতেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যার পর রাজমোহনের বাড়িতে শুভাগমন করেন এবং ভক্তগণের উপাসনাদি দেখেন ও নরেন্দ্রনাথের গান শুনিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রাজমোহন ঠাকুরকে জলযোগে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র ডাক্তার [রাজেন্দ্রলাল দত্ত] (১৮১৮ - ১৮৮৯) -- শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। ঠাকুরের চিকিৎসকদের অন্যতম। কলিকাতার বহুবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রূর দত্তের বংশধর। বিখ্যাত হোমোওপ্যাথিক চিকিৎসক। স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার অনুপ্রেরণায় হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করেন। রাজেন্দ্রলাল প্রথমে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করেন। পরে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের সেবার অধিকার পাইয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তিনি মখমলের যে কোমল জুতাজোড়া আনিয়া স্বয়ং ঠাকুরকে পরাইয়া দিয়াছিলেন আজও তাহা বেলুড় মঠে পূজিত হয়।

রাজেন্দ্রনাথ মিত্র -- ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ইংরেজ সরকারের প্রথম ভারতীয় অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, ভাইসরয়ের আইন মন্ত্রী। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহীভক্তদ্বয় রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের মেসোমশাই ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁহার বন্ধু। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মনোমোহনের বাটীতে রামকৃষ্ণদেব শুভাগমন

করেন। কেশবচন্দ্র সেন ও রাজেন্দ্র মিত্র সেইস্থলে উপস্তিত ছিলেন। কেশবের অনুরোধে রাজেন্দ্র তাঁহার গৃহে ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খ্রী: একটি উৎসবের আয়োজন করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমন্ত্রিত হন। পথে সুরেন্দ্র ঠাকুরকে রাধাবাজারের স্টুডিওতে লইয়া গিয়া ফটো তোলান। রাজেন্দ্র মিত্রের গৃহে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের পর ঠাকুর কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে সমাধিস্থ হন।

রাধিকা (প্রসাদ) গোস্বামী (১৮৬৩ -- ১৯২৪) -- বৈষ্ণব ভক্ত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন ও প্রণাম করেন। তিনি অদ্বৈত প্রভুর বংশধর জানিয়া ঠাকুরও ভক্তিভরে তাঁহাকে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করেন। উত্তরকালে ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ হইয়াছিলেন।

রানী রাসমণি (১৭৯৩ - ১৮৬১) -- দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতে রানী জগন্মাতার অষ্টনায়িকার অন্যতমা। পুণ্যশ্লোকা, পরোপকারিণী, দানশীলা, তেজস্বিনী মহিলা। জন্ম চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহরের কাছে "কোনা" গ্রামে। পিতা হরেকৃষ্ণ দাস। মাতা রামপ্রিয়া দেবী। মাতৃদত্ত নাম রানী, পরবর্তী কালে রানী রাসমণি হিসাবে পরিচিতা। ১১ বৎসর বয়সে কলিকাতার জানবাজারের জমিবার রাজচন্দ্র দাসের সহিত বিবাহ হয়। এই সময় হইতেই ভগবদভক্তির সহিত দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা এবং হৃদয়বত্তা তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে লক্ষিত হয়। মৎস্যজীবিদের জন্য গঙ্গার জলকর রহিত করা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। তবে তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্নানযাত্রার দিন শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিধানে এবং পৌরোহিত্যে মন্দিরের এবং ৺ভবতারিণীমাতার বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকার্য মহাসমোরহে সম্পন্ন হয়। অন্য কেহ রাজি না হওয়ায় রামকুমারই দেবীর নিত্য পূজা করিতে থাকেন। ইহার কিছুকাল পরে ঠাকুর এই পূজার ভার গ্রহণ করেন। তখন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রানী রাসমণি আজীবন ঠাকুরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্রী ছিলেন এবং ঠাকুরের সব কাজে রানীর সম্মতি থাকার দরুণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পক্ষে নির্বিঘ্নে সকলপ্রকার সাধন-ভজন করা সম্ভবপর হয়।

রাম কবিরাজ -- নাটাগড়ে বাড়ি ইনি ঠাকুরের পেটের অসুখের সময় দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দেখিতে আসেন। ঠাকুরের এই অসুখের ফলে অতি দুর্বল শরীরেও ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় ঠাকুরের উক্ত রোগের উপশম হয়।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮০৫ - ১৮৫৭) -- শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রামকৃষ্ণদেবের জীবনে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পিতার ঈশ্বরানুরাগ এবং বৈষয়িক জ্ঞান, উভয়ই তাঁহার চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান, বাক্‌সিদ্ধ, সৎ প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর সংসারের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তিনি কলিকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে একটি টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে (শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বনাম) কলিকাতায় লইয়া আসেন। রামকুমার ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রানী রাসমণি স্থাপিত দক্ষিণেশ্বর ৺কালীমন্দিরের স্থায়ী নিত্য পূজকের পদ গ্রহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরে শারীরিক অপটুতাবশতঃ তিনি গদাধরকে ৺কালীপূজার ভার অর্পণ করেন ও নিজে ৺রাধাকান্তের পূজার ভার নেন। রামকুমার স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূজাবিধি, ও চণ্ডীপাঠ সেখান। এইভাবেই তাঁহার প্রচেষ্টা ও শিক্ষায় গদাধর দক্ষিণেশ্বরে স্থায়ী পূজকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতার উত্তরস্থ মূলাজোড় নামক স্থানে কার্যোপলক্ষে গমন করিয়া সান্নিপাতিক জ্বরে দেহত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১ - ১৮৯৯) -- শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত। কলিকাতার নিকটবর্তী নারিকেলডাঙ্গায়

৩০/১০/১৮৫১ তারিখে বৈষ্ণব কুলে জন্ম। পিতা নৃসিংহপ্রসাদ, মাতা তুলসীমণি, স্ত্রী কৃষ্ণপ্রেয়সী। প্রথম জীবনে বিজ্ঞানচর্চার ফলে তিনি নাস্তিক ও যুক্তিবাদী হইয়া পড়েন। আকস্মিকভাবে একটি কন্যা সন্তানের মৃত্যুতে তাঁহার তত্ত্বান্বেষণের সূচনা হয়। তাঁহার মাসতুতো ভাই মনোমোহন মিত্রের সহিত তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন। দর্শনমাত্র তাঁহার হৃদয় শান্ত হয়। তিনি ঠাকুরের নিকট যাতায়াত শুরু করেন এবং তিনিই যে তাঁহার আরাধ্য দেবতা তাহা অনুভব করিতে থাকেন। ১৮৮০ এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর তাঁহার গৃহে শুভাগমন করেন। ফলে রামচন্দ্রের মন আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি ও মনোমোহনবাবু একযোগে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন এবং এ সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। রামচন্দ্র ঠাকুরের জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার উপদেশ ও জীবনী অবলম্বনে "তত্ত্বাসার" ও "তত্ত্বপ্রকাশিকা" বা "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" নামক পুস্তক এবং "তত্ত্বমঞ্জরী" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। কাঁকুড়গাছিতে ঠাকুরের অনুমতিক্রমে একটি বাগানবাড়ি ক্রয় করিয়া বিখ্যাত "যোগদ্যানের" প্রতিষ্ঠান করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর এখানে শুভ পদার্পণ করেন। পরবর্তী কালে ঠাকুরের দেহরক্ষার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ওই স্থানটিকে মহাতীর্থে পরিণত করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আজীবন মহাভক্ত শ্রীরামচন্দ্র "যোগোদ্যানে" দেহত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -- নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পিতার নাম কার্তিকরাম। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর পিতৃদেব। নিবাস বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রামে। স্ত্রী শিহড় গ্রামের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্যামাসুন্দরীদেবী। সারদাদেবী তাঁহাদের প্রথম সন্তান। শ্রীশ্রীমা নিজে তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন -- তিনি পরম রাম ভক্ত, নৈষ্ঠিক ও পরোপকারী ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামচন্দ্র কন্যা সারদাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে জামাতার (শ্রীরামকৃষ্ণের) নিকট উপস্থিত হন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৮ই চৈত্র রামনবমী তিথিতে জয়রামবাটিতেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

রাম চাটুজ্যে -- কথামৃতে তাঁহাকেও কখনও রাম চক্তবর্তী বলিয়া উল্লেখ করা আছে। দক্ষিণেশ্বরেই থাকিতেন। ঠাকুরের ভক্ত। ঠাকুর তাঁহার তত্ত্বাবধানের প্রশংসা করিতেন, কারণ ঠাকুরের ভক্তদের আহারাদি সম্পর্কে তিনি সর্বদা যত্নবান ছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের পূজারী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর কাশীপুরে থাকাকালীন রাম চাটুজ্যে নিয়মিত তাঁহার খোঁজখবর লইতেন।

রামতারণ -- গিরিশচন্দ্র ঘোষের থিয়েটারের অভিনেতা ও সুগায়ক। শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনাইবার জন্য গিরিশবাবু রামতারণকে লইয়া আসেন। তাঁহার ভক্তিমূলক গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন।

রামদয়াল চক্রবর্তী -- শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। নিবাস আঁটপুর। বলরাম বসুর পুরোহিত বংশের সন্তান। হোরমিলার ষ্টীমার কোম্পানির ঠিকাদার ছিলেন। কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের কথা শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে থাকেন। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), মাস্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে রামদয়াল বহুদিন দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও করিয়াছেন। ঠাকুর স্নেহভরে রামদয়ালকে নানা উপদেশ দিতেন। রামদয়ালের আহ্বানেই ভক্ত বলরাম বসু কটক হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিবার পরের দিনই রামদয়াল বলরাম বসুকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামদয়াল আজীবন রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিতে তাঁহার নাম বহুবার উল্লিখিত আছে।

রামনারায়ণ -- ডাক্তার, গোঁড়া হিন্দু। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের নিকট শ্যামপুকুর বাটীতে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য -- শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত রামপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্তী আড়িয়াদহের অধিবাসী। ভক্তবর কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্যের পুত্র। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর রামপ্রসন্ন মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রাণায়াম করিতেন। একবার রামপ্রসন্ন তাঁহার বৃদ্ধা মায়ের সেবা না করিয়া হঠযোগী সাধুর সেবা করার জন্য ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রামলাল -- ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহভরে "রামনেলো" বলিয়া ডাকিতেন। এবং বেলুড় মঠের সকলের নিকট তিনি "রামলাল দাদা" নামে পরিচিত ছিলেন। রামেশ্বর দেহত্যাগের পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর পূজকের পদে নিযুক্ত হন এবং আজীবন সেই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেকবার গান শুনাইয়াছেন। ঠাকুর কাশীপুরে কল্পতরু দিবসে রামলালকেও কৃপা করেন।

রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় -- (১৮২৬-৭৩) -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা। সাংসারিক বিষয়ে তিনি চিরকাল উদাসীন ছিলেন। তিনি চারিবৎসরকাল দক্ষিণেশ্বরে মা ৺কালীর পূজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। কামারপুকুরে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র রামলাল, শিবরাম ও কন্যা লক্ষ্মীমণি।

লক্ষ্মী-দিদি (১৮৬৪ - ১৯২৬) -- ঠাকুরের কৃপাধন্য মহাসাধিকা লক্ষ্মীমণি দেবী ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের কন্যা এবং রামলাল ও শিবরামের ভগিনী। ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীর নিকট তিনি লক্ষ্মী-দিদি নামে পরিচিতা ছিলেন। এগার বৎসর বয়সে বিবাহের অল্প কয়েকদিন পরেই তাঁহার স্বামী চিরদিনের মতো নিরুদ্দেশ হন। ১২ বৎসর অপেক্ষা করিবার পর তিনি শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পিতৃগৃহেই বাস করিতে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী হিসাবে তিনি নহবত ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সর্বক্ষণ থাকিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাদের উভয়কে 'শুক-সারী' বলিয়া ডাকিতেন। পূর্বে উত্তরদেশীয় এক সন্ন্যাসীর নিকট শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেও ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় 'রাধাকৃষ্ণ' নাম ও বীজ লিখিয়া পুনরায় তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। লক্ষ্মী-দিদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরু, ইষ্ট ও অবতাররূপে জ্ঞান করিতেন অপরপক্ষে ঠাকুরও তাঁহাকে মা-শীতলার অংশরূপে জানিতে পারিয়া কাশীপুরে থাকাকালীন মা-শীতলারূপে পূজা করিয়াছিলেন। দেব-দেবী সাজিয়া, নাচিয়া গাহিয়া তিনি সকলের আনন্দ বিধান করিতে অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। এইরূপ এক আসরে ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং সিংহ সাজিয়া তাঁহাকে ৺জগদ্ধাত্রীরূপে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী-দিদি মন্ত্রদীক্ষা দিয়া অনেককে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তরাই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে একটি দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করিয়া দিলে সেখানেই তিনি দীর্ঘ ১০ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। পুরীধামের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া ভক্তেরাও সেখানেও তাঁহার জন্য 'লক্ষ্মীনিকেতন' নামে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়া দেন। এই বাড়িতেই ২৪।২।১৯২৬ তারিখে তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী -- শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরাগী ভক্ত, বিত্তশালী ব্যক্তি। কলিকাতায় থাকিতেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিতেন। ইনি ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা লিখিয়া দিতে চাহিলে ঠাকুর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন।

লাটু (রাখতুরাম -- স্বামী অদ্ভুতানন্দ) -- বিহারের ছাপরা জেলার কোন এক গ্রামে জনৈক মেষ-

পালকের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-সাল, তারিখ বা তিথি -- সবকিছু অজ্ঞাত। জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি কলিকাতায় আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত রামচন্দ্রের গৃহে তিনি কাজ করিতেন। তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে সস্নেহে 'লালটু' নামে ডাকিতেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে আসিয়া লাল্টু প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ঠাকুর লালটুকে স্পর্শ করিলে তাঁহার জীবনের গতি অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। লালটুর মন অন্য সব ভুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দিক ধাবিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রও লালটুকে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইতেন। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্রের কাছ হইতে তাঁহাকে সেবকরূপে চাহিয়া লন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহময় মুখে লাটু বা নেটোতে পরিণত হইয়াছিল। ঠাকুরের শিক্ষা অনুযায়ী ধীরে ধীরে লাটুর আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইতে থাকে। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঠাকুরের কাছে আসেন। সেইসময় হইতে ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিন অবধি দীর্ঘকাল ঠাকুরের সেবা ও সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য লাটুর হইয়াছিল। শ্রীশ্রীসারদা দেবীর কাজে সহায়তা করিবার সুযোগও লাটুর জীবনে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে লাটু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত। নিজেকে কঠোর জপধ্যানে নিয়োজিত রাখিয়া এবং ভারতের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি শেষ জীবন কাশীতে অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল কাশীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শম্ভুচরণ মল্লিক -- ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার। কলিকাতার সিঁদূরিয়াপটির কমলনাথ স্ট্রীটের পৈতৃক বাড়িতে সুবর্ণবণিক কুলে জন্ম। সনাতন মল্লিকের একমাত্র পুত্র। সওদাগরী অফিসে মুৎসুদ্দির কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির অনতিদূরে তাঁহার উদ্যানবাটিতে যাতায়াত এবং অবস্থান উপলক্ষেই ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ঠাকুর শম্ভুবাবুর নিকট বাইবেল শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্টের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে অবগত হন। প্রথমদিকে শম্ভুচরণ ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হইলেও ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিবার পর মহামূল্য অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী হন। ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শম্ভুচরণ ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। নহবতে শ্রীমায়ের থাকিবার অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া তিনি মন্দিরের নিকটেই একটি কুটির নির্মাণ করিয়া দেন। মথুরবাবুর দেহান্ত হইবার কিছুদিন হইতেই ঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিনিই সরবরাহ করিতেন। চার বৎসর একনিষ্ঠ সেবা করিবার পর তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে ঠাকুর শম্ভুচরণকে দেখিতে যান। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই শম্ভুচরণের দেহান্ত ঘটে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

শরৎচন্দ্র -- বরাহনগর নিবাসী সদাচারনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক। বরাহনগর মঠে প্রায়ই আসিতেন। কিছুকাল বৈরাগ্যবশতঃ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শরৎ [শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী -- স্বামী সারদানন্দ] (১৮৬৫ - ১৯২৭) -- শরৎচন্দ্রের জন্ম কলিকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটে। পিতা গিরিশচন্দ্র এবং মাতা নীলমণি দেবী। পিতা ধনী ব্যক্তি ছিলেন। শরৎচন্দ্র মেধাবী ছাত্র হিসাবে হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ-এ ভর্তি হন। ছাত্র জীবনে কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হইয়াছিলেন। কিন্তু খুড়তুত ভাই শশিভূষণ (পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের তীব্র বৈরাগ্যের উপদেশ শরতের জীবনে এক অভিনব আলোকসম্পাত করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্রেম ব্যবহার আরও দৃঢ়তর রূপে দক্ষিণেশ্বরের দিকে টানিতে লাগিল। কোন কোন দিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়াও যাইতেন। গভীর রাত্রে ঠাকুর তাঁহাকে তুলিয়া দিয়া পঞ্চবটী, বেলতলা, অথবা ৺ভবতারিণীর নাট মন্দিরে ধ্যান করিতে পাঠাইতেন। পিতামাতার আশীর্বাদ লইয়াই তিনি গৃহত্যাগ করেন। বহুদিন তীর্থে তীর্থে পর্যটন ও তপস্যা করেন। স্বামীজীর আহ্বানে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গিয়া সাফল্যের সহিত প্রচার কার্য চালাইয়া যান। এরপরে কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাদারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। অবশিষ্ট জীবন এই পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকায় গমন করিলে উদ্বোধন

পত্রিকার সমস্ত দায়িত্ব বহন করেন। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় তাঁহার প্রচেষ্টা স্মমরণীয়।

বাগবাজার উদ্বোধন অফিসে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বাড়ি নির্মাণ তাঁহার আরেক স্মরণীয় কাজ। স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর হইতে স্বামী সারদানন্দই শ্রীশ্রীমায়ের প্রধান সেবকরূপে পরিগণিত হন। শ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'শরৎ আমার ভারী।'

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' মহাগ্রন্থ রচনা, জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা (১৯২৩ খ্রীঃ), ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি তাঁহার স্মরণীয় কীর্তি। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২শে আগস্ট তিনি দেহত্যাগ করেন।

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫০ - ১৯২৮) -- ফরিদপুর জেলার মুখডোবা গ্রামে যজুর্বেদী কাশ্যপ বংশে জন্ম। পিতা হলধর বিদ্যামণি, মাতা সুরেশ্বরী দেবী। পিতার নিকট তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হিন্দুধর্মপ্রচারে আগ্রহী হইয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। কাশিমবাজারের রাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া ভক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠনঠনিয়ার বাড়ি হইতে গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। ঠাকুরের কথা ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত এক সপ্তাহের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসেন। ওই বৎসরের উল্টোরথের দিন বলরাম-মন্দিরে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করেন। পরে আরো কয়েকবার তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। শেষ বয়সে তিনি বহরমপুর জুবিলীটোলের অধ্যক্ষ হন। মুর্শিদাবাদের খাগড়ায় স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করিয়া শেষ জীবন সেখানে অতিবাহিত করেন।

শশী [শশীভূষণ চক্তবর্তী -- স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] (১৮৬৩ - ১৯১১) -- হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র তান্ত্রিক সাধক এবং পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত। বাল্যকাল হইতেই শশিভূষণ ধর্মভাবাপন্ন এবং মেধাবী। মাতা অতিশয় উদার হৃদয়া ও সরলা ছিলেন। তিনি এলবার্ট কলেজ হইতে এফ. এ. পাশ করেন এবং মেট্রোপলিটন কলেজে বি. এ. পড়েন। সংস্কৃতে ও অঙ্কে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ছাত্রজীবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কেশব সেনের কাছে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়া জ্যাঠতুত ভাই শরতের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। প্রথম দিনেই ঠাকুর শশীর মন জয় করিয়া নিলেন। এরপরে ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে শশী ক্রমে নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তদের সহিত পরিচিত এবং প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হন। ঠাকুর একদিন শশীকে জানাইয়া দেন যে তিনি অর্থাৎ ঠাকুরই তাঁহার অভীষ্ট বস্তু। ইহার পরে হইতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ হইয়া ওঠেন। শরৎ আর শশীকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণ ঢালিয়া ঠাকুরের সেবা করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত হন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে ইনি অন্যতম। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি মাদ্রাজে গিয়া সেখানেও ঠাকুরের পূজা আরম্ভ করেন। কবি নবীনচন্দ্র এবং ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রেঙ্গুনে তাঁহার দেখা হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় মাদ্রাজে ও বাঙ্গালোরে স্থায়ী মঠ গড়িয়া ওঠে। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণে আসিলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সর্বতোভাবে তঁহার দর্শনাদির সুব্যবস্থা করেন। ১০৮টি সোনার বেলপাতায় শ্রীশ্রীমা রামেশ্বরে ৺শিবের পূজা করিয়াছিলেন। এইসবই শশী মহারাজের ব্যবস্থায় হয়। তাঁহার লেখা অনেক গ্রন্থ আছে। কলিকতার উদ্বোধনের বাড়িতে তিনি দেহ্যতাগ করেন।

শালগ্রামের ভাই -- তার ছেলে বংশলোচনের কারবার ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে সে বিরাশি রকমের আসন জানিত ও যোগসমাধির কথা বলিত। হঠযোগীদের দেহের উপর অত্যধিক আসক্তির

ফলে তাহাদের মন ঈশ্বরের দিকে অধিকসময় থাকে না। টাকার লোভে সে দেওয়ান মদন ভট্টের কয়েক হাজার টাকার একটি নোট গিলিয়া ফেলে। কিন্তু পরে উহা আদায় হয়, এবং তাহার তিন বৎসর জেল হয়।

শিবচনদ্র -- ঠনঠনের বাসিন্দা। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিয়াছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭ - ১৯১৯) -- শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অনুরাগী, ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা, সুলেখক এবং শিক্ষাব্রতী। চব্বিশ পরগণার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। ব্রাহ্ম নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সহযোগী। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্রের সহিত মতবিরোধের ফলে, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে ক্রমে এফ. এ. (১৮৬৮), বি. এ. (১৮৭১) এবং এম. এ. পাস করিয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য করিবার সময় শিবনাথ 'ইণ্ডিয়ন মিরর' পত্রিকাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গে পাঠ করেন। আচার্য কেশব সেনের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। শিবনাথ রচিত বহু গ্রন্থ তাঁহার সাহিত্য ও ধর্ম-চর্চার সাক্ষ্য বহন করে। ইহাদের মধ্যে 'আত্মচরিত' (১৯১৮), "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", History of the Brahmo Samaj (1911-12), Men I have seen (1919) উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শেষোক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নিবন্ধ হইতে জানা যায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বহুবার যাতায়াত করেন এবং তাঁহার অহেতুকী স্নেহ ধারায় নিজেকে সিঞ্চিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনের বহু আধ্যাত্মিক আদর্শকে রসপুষ্ট করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভের জন্য ঠাকুরের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং কঠোর জীবনযাপন শিবনাথকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল। শিবনাথের সরলতা ও নিষ্ঠার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে পরম স্নেহ করিতেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে শিবনাথকে দেখিবার জন্য উতলা হইতেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আনন্দ পাইতেন। ঠাকুরের অন্তিম অসুখের সময় শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে শেষবারের জন্য দেখিতে যান। কেবলমাত্র সাহিত্যিক হিসাবেই নয়, সত্যনিষ্ঠা, সরল বিশ্বাস এবং ঐকান্তিকতার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম আজও সমাজে আদৃত।

শিবরাম চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৬ - ১৯৩৩) -- ঠাকুরের মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম কামারপুকুরে। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপাধন্য। শিবরামকে 'ভিক্ষাপুত্র' বলিতেন। ভক্তমহলে তিনি 'শিবুদা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বিশেষ পীড়াপীড়িতে শ্রীমা নিজেকে ৺কালী বলিয়া স্বীকার করেন। কথামৃতে শ্রীশ্রীঠাকুর শিবরামকে বালকোচিত সারল্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীনাথ ডাক্তার -- শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, বেদান্তবাদী চিকিৎসক। নিবাস কলিকাতা। ঠাকুরের অন্তিম অসুখের সময় তিনি চিকিৎসক হিসাবে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। বেদান্তমতে "সব স্বপ্নবৎ" -- একথা সংসারী লোকের পক্ষে ভাল নয় বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীনাথ মিত্র -- ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কাশীশ্বর মিত্রের পুত্র। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। পর বৎসর তাঁহার বাড়িতে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মমহোৎসবে ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গান্তে দয়াসিন্ধু ঠাকুর অসুবিধার মধ্যেও আহার করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন।

শ্রীরাম মল্লিক -- কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যসঙ্গী; সিওড়ে তাঁহাদের বাড়ি ছিল। বাল্যকালে উভয়ের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে শ্রীরাম ঘোরতর বিষয়ী হইয়া পড়েন। চানকে তাঁহার দোকান ছিল।

শ্রীশ মুখোপাধ্যায় -- শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ঠনঠনে নিবাসী ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহপাঠী। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন ছিলেন। প্রথমে আলিপুরে ওকালতি করিতেন এবং পরে ডিস্ট্রিক্ট জজ হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে আগমনকালে ঠাকুরের সহিত তাঁহার ধর্মালোচনা হয়। ঠাকুর তাঁহার শান্তস্বভাব দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা [শ্রীশ্রীসারদা দেবী] (১৮৫৩ - ১৯২০) -- পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সারদাদেবীর জন্ম হয়। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর প্রথম সন্তান। শিশুকাল হইতেই তাঁহার জীবনে সেবা, পরোপকার, দয়া, ক্ষমা, সত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি বিকশিত হয়। ছয় বৎসরের সারদার বিবাহ হয় ২৪ বৎসরের যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। বিবাহের পর কখনও জয়রামবাটীতে কখনও কামারপুকুরে কাটাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে সাধনমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের উন্মত্ততা সম্পর্কে নানাবিধ গুজব শুনিয়া তিনি একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিয়া আসিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পর পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন ফলহারিণী কালীপূজার দিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকর্তৃক ষোড়শীরূপে পূজিতা হন। পরে জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন করেন। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করেন। অপরদিকে সারদাদেবীর জীবনে শুরু হয় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আদর্শ জীবন যাপনের শিক্ষা -- পবিত্র সুন্দর চরিত্র কিভাবে গঠন করিতে হয়, দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ কিভাবে সুসম্পন্ন করিতে হয়, সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে ঈশ্বর-আরাধনায় নিমগ্ন থাকা যায় ইত্যাদি। অসুস্থাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ বাটী ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে থাকাকালীন সারদাদেবী তাঁহার সেবাতেই নিযুক্তা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তে কিছুকাল তীর্থদর্শনাদি ও তপস্যায় অতিবাহিত করেন। তারপর বিভিন্ন সময়ে তিনি কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কলিকাতা, ঘুষুড়ী, বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। শেষ কয় বৎসর তিনি কলিকতার বাগবাজারে ১নং উদ্বোধন লেনের বাড়িতে (মায়ের বাড়ি) অতিবাহিত করেন এবং এই বাড়িতেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তাঁহার মহাসমাধি হয়। সঙ্ঘমাতারূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেন। তাঁহার জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জিত। কিন্তু শ্রীমা জগতের সামনে একটি মহৎ জীবন-দর্শনকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতার মতে, ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীসারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের চরম কথা।

শৈলজাচরণ মুখুজ্জে -- কলকাতার বেচু চ্যাটার্জ্জী স্ট্রিটের শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবক। এই মন্দির প্রাঙ্গণেই ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার ঝামাপুকুরে প্রথম টোল খুলিয়াছিলেন। শৈলজাচরণ মিত্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শোকাতুরা ব্রাহ্মণী (১৮৬৪ - ১৯২৪) -- শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ‘গোলাপ-মা’ বলিয়া পরচিতা। প্রকৃত নাম অন্নপূর্ণা দেবী, নামান্তরে গোলাপসুন্দরী দেবী। কথামৃতে ‘শোকাতুরা ব্রাহ্মণী’ বলিয়া উল্লিখিত। উত্তর কলিকাতার বাগবাজারে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী চণ্ডীর সহিত ঠাকুর পরিবারের সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বিবাহ হয়। অকালে স্বামী, পুত্র এবং বিবাহিতা কন্যা “চন্ডী”র মৃত্যুতে তাঁহার জীবনে নিদারুণ শোক নামিয়া আসে। সেইসময় যোগীন-মা এই শোকাতুরা মহিলাকে ঠাকুরের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলে ঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্যে তাঁহার শোকতাপ দূরীভূত হয়। পরবর্তী কালে ঠাকুরের করুণায় গোলাপ-মা দক্ষিণেশ্বরে নহবত-ঘরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পান এবং সেখানে মধ্যে মধ্যে থাকিয়া সেবা করার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হন। পরবর্তী সময়ে শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরেও তিনি অসুস্থ ঠাকুরের যথাসাধ্য সেবা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের তিরোভাবের পর ভাগ্যবতী গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়ের সেবার ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে বহু তীর্থ দর্শন করেন। শেষজীবনে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বাগবাজারে উদ্বোধন মঠে বাস করিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের তিরোভাবের পর

তিনি ভক্তদের সেবা ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

শ্যাম ডাক্তার -- ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন ও তাঁহার নিকট ভগবৎ কথা শুনিয়াছিলেন।

শ্যাম দাস -- প্রখ্যাত কীর্তনিয়া। ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্ত তাঁহার নিকট কীর্তন শিখিতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্যাম দাসের "মাথুর" কীর্তন শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্যাম বসু -- শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স্ক ভক্ত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। ঈশ্বর চিন্তার প্রতি তাঁহার মন ব্যাকুল হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে সাধন সম্বন্ধে নানাবিধ নির্দেশ দান করেন।

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ন্যায়বাগীশ) -- শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। নিবাস হুগলী জেলার আঁটপুর। এই নিরহঙ্কার পণ্ডিতকে ঠাকুর বিশেষ স্নেহ করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট দক্ষিণেশ্বরে শ্যামাপদর মুখে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আবৃত্তি শুনিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হন এবং সমাধিস্থ অবস্থায় শ্যামাপদর ক্রোড়ে ও বক্ষে শ্রীচরণ স্থাপন করিয়া বিশেষ কৃপা করেন।

শ্যামাসুন্দরী দেবী (শ্যামাসুন্দরী মিত্র) -- শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা ভক্ত। ঠাকুরের গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্রের জননী। তাঁহার চারি কন্যা ও তিনি জামাতা শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহর তৃতীয় জামাতা রাখালচন্দ্র (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ)। পতিবিয়োগের পর শ্যামাসুন্দরী ঠাকুরের আমন্ত্রণে একবার পুত্র-কন্যাসহ দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং ঠাকুরের নির্দেশমত এক জায়গাতেই প্রসাদ গ্রহণের জন্য বসেন। নিজের ভোজন পাত্র হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিধবা শ্যামাসুন্দরীকে মাছের মুড়ো দিলে শ্যামাসুন্দরী প্রসাদজ্ঞানে বিনা দ্বিধায় তাহা গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে মহোৎসবের সময় নাম-কীর্তন শুনিতে শুনিতে ভাগ্যবতী শ্যামাসুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করেন।

শ্যামাসুন্দরী দেবী -- শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মাতৃদেবী। জন্মস্থান -- বাঁকুড়া জেলার সিহড় গ্রাম। পিতা হরিপ্রসাদ মজুমদার। জয়রামবাটীর কার্তিকরাম মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। সারদাদেবী ইঁহাদেরই প্রথম সন্তান। শ্রীরামকৃষ্ণজননী চনদ্রমণি দেবীর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আর্বিভাবের পূর্বে যেমন অলৌকিক দর্শনাদি হইয়াছিল, শ্রীশ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাবের পূর্বেও তেমন অলৌকিক দর্শনাদি শ্যামাসুন্দরীদেবীর জীবনেও ঘটিয়াছিল। দেব-দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণা, অমায়িক, অতিথিবৎসলা শ্যামাসুন্দরী দেবী সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন -- "আহা, আমার মা ছিলেন যেন লক্ষ্মী। সমস্ত বছর সব জিনিস পত্রটি গুছিয়ে-টুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতেন।"

সদরওয়ালা -- সাবজজ। ব্রাহ্মভক্ত। সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার কথোপকথন হয়। (১৯-১০-৮৪)

সরী পাথর -- সরস্বতী পাথর। সিহড় নিবাসিনী মহিলা। তিনি "ঘোষপাড়ার মতে"র সাধিকা ছিলেন। 'পাথর' তাঁহার পদবী। সরীর সাধনার কথা শুনিয়া ঠাকুর হৃদয়ের সহিত স্বেচ্ছায় তাঁহার বাড়িতে খাইয়া সেখানকার

পরিবেশ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সরীও ঠাকুরকে পরম আন্তরিকতার সহিত আপ্যায়ন করিয়াছিলেন।

সহচরী -- শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে আগতা, প্রবীণা ও প্রসিদ্ধা মহিলা কীর্তনিয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবদিবসে (২৫-৫-১৮৮৪) তিনি কীর্তন পরিবেশন করিয়াছিলেন। এবং ইহা শুনিয়া ঠাকুরের ভাব সমাধি হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন। ওইদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, তাঁহার গান, নৃত্য ও সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

সাতকড়ি -- নরেন্দ্রনাথের সমবয়স্ক বরাহনগরবাসী যুবক ভক্ত। বরাহনগর মঠে যাইতেন এবং মঠবাসীদের সেবা করিতেন। তাঁহার গাড়িতে নরেন্দ্রনাথ কখন কখন কলিকাতা হইতে মঠে আসিতেন।

সাধু নাগ মহাশয় [দুর্গাচরণ নাগ] (১৮৪৬ - ১৮৯৯) -- শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গৃহী ভক্ত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবসায়ে খ্যাতি সম্পন্ন। ঢাকার দেওভোগ গ্রামে জন্ম। ভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্তের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। (১৮৮২ / ৮৩ খ্রীষ্টাব্দে)। কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের রোগ নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিলে ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে 'জ্বলন্ত আগুন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে নাগমহাশয় সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান করিতেন। এই জ্ঞানানুভূতির তীব্রতায় আত্মহারা হইয়া পড়িতেন বলিয়া মায়ের নিকট যাইতে তাঁহার অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হইত। তিনি বলিতেন, বাপের চেয়ে মা দয়াল। শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীও তাঁহার অসীম ভক্তি ও মহাপুরুষোচিত গুণাবলীর অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর নাগ মহাশয় মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

সামাধ্যায়ী -- ব্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ী -- এক তার্কিক পণ্ডিত। উত্তরপাড়ার নিকট ভদ্রকালীতে -- এক কীর্তনের আসরে ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহা ব্যতীত কমলকুটীরেও শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতের ইশ্বর উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া তাঁহার বক্তব্যে ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন।

সারদাচরণ -- অধরের বন্ধু। পুত্র শোকগ্রস্ত হইয়া তিনি ঠাকুরের নিকট অধরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার শোকের কথা শুনিয়া একটি গান গাহিয়া ও উপদেশ দিয়া তাঁহাকে সংসারের অনিত্যতার কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন।

সিঁথির গোপাল [গোপাল চন্দ্র ঘোষ -- স্বামী অদ্বৈতানন্দ] (১৮২৮ - ১৯০৯) -- চব্বিশ পরগণা জেলার জগদ্দলের রাজপুর গ্রামে জন্ম। পিতা গোবর্ধন ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণের অপেক্ষাও তিনি বয়সে বড় ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বুড়ো গোপাল অথবা মুরুব্বি আখ্যা দিয়াছিলেন। ভক্তমহলে তাঁহার নাম গোপালদা। সন্ন্যাসের পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে স্বামী অদ্বৈতানন্দ অন্যতম। উত্তর কলিকাতার সিঁথি নিবাসী ব্রাহ্মভক্ত ও ব্যবসায়ী বেণীমাধব পালের কলকাতার চীনাবাজারে একটি দোকানে গোপালচন্দ্র চাকুরী করিতেন। সেই সূত্রেই সিঁথিতে বাস করিতেন। বেণীমাধবের সিঁথির বাড়িতেই ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে গোপালচন্দ্র ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। স্ত্রী বিয়োগের ব্যথায় তখন তিনি কাতর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া তাঁহার ভালবাসায় গোপাল বাঁধা পড়েন। অবিরত ভাগবতী কথা ও বৈরাগ্যের অনুপ্রেরণা পাইয়া গোপাল বুঝিলেন যে, সংসার মায়ামরীচিকা এবং একমাত্র বৈরাগ্যই শোকসন্তপ্ত জীবনের মহৌষধ। এইভাবে গোপাল সম্পূর্ণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণের পরে তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইতে থাকে। অক্লান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়া তিনি ধন্য হন। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীও গোপালদার কাছে নিঃসন্দেহে কথাবার্তা বলিতেন। তিনি ডাক্তারের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য

বিশেষ পথ্য প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়া যথা সময়ে উহা শ্রীশ্রীমাকে শিখাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাতে নিজ জীবন চরিতার্থ করিলেও তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ মন তপস্যার জন্য ব্যাকুল হইত। কাশীপুরে থাকাকালে একবার তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় সমবেত গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধুদের গেরুয়া বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দিতে চাহিলে ঠাকুর নির্দেশ দিলেন উহা তাঁহার ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। ঠাকুরের নির্দেশে দ্বাদশখানি গেরুয়া বস্ত্র ও সমসংখ্যক রুদ্রাক্ষের মালা তিনি ঠাকুরকে অর্পণ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে উহা নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল, কালী ও লাটুকে দান করেন। আরেকখানি গেরুয়া বস্ত্র গিরিশের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। পরে গিরিশচন্দ্র তাহা গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এবং গোপালচন্দ্রের জীবনে ইহা স্মরণীয় ঘটনা। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮শে ডিসেম্বর তিনি স্বধামে গমন করেন।

সিঁথির ব্রাহ্মণ -- পণ্ডিত ব্যক্তি। কাশীতে বেদান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন। তাঁহার সহিত দয়ানন্দ ও কর্ণেল অলকটের বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহাকে সাধুসঙ্গ করার, অনাসক্ত হইয়া দাস ভাবে সংসারে থাকিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

সিধু (সিদ্ধেশ্বর মজুমদার) -- উত্তর বরাহনগরের বাসিন্দা। মাস্টার মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম গিয়াছিলেন।

সিস্টার নিবেদিতা -- [ভগিনী নিবেদিতা] (১৮৬৭ - ১৯১১) -- পূর্বনাম মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। স্বামিজীর বিদেশী শিষ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন না করিলেও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপা ও স্নেহ লাভ করেন। এদেশে স্ত্রী-শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ The Master as I saw him, Cradle Tales of Hinduism ইত্যাদি। মার্গারেট যখন প্রচলিত ধর্ম ও গতানুগতিক জীবন সম্পর্কে সংশয়ে দোদুল্যমান, সে সময়ে ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর প্রভাবে তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে আসেন। ওই খ্রীষ্টাব্দেরই ২৫শে মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিয়া 'নিবেদিতা' নামে অভিহিত করেন। নিবেদিতা বিবেকানন্দের কথামত ভারতবাসীর সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। এই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীগুরু ও সতীশ মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটির' সংস্পর্শে আসেন। অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। ভারতের মঙ্গলে নিবেদিত প্রাণ এই বিদেশিনী রোগমুক্তির জন্য দার্জিলিং-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলা বসুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং শহরেই তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

সুবোধ [সুবোধচন্দ্র ঘোষ -- স্বামী সুবোধানন্দ] (১৮৬৭ - ১৯৩২) -- কলিকাতার ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার সেবক শ্রীশঙ্কর ঘোষের পৌত্র। পিতা কৃষ্ণদাস ঘোষ এবং মাতা নয়নতারা দেবী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া সুবোধচন্দ্র প্রথমে "অ্যালবার্ট কলেজিয়েট স্কুল" এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। ছাত্রাবস্থাতেই সুবোধচন্দ্র প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহ-সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার মন বৈরাগ্যপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তিনি লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন। তাঁহার বালক সুলভ স্বভাবের জন্য তিনি গুরু ভ্রাতাগণের নিকট 'খোকা মহারাজ' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। মঠে যোগদানের পর তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ ও তপস্যাদি করিয়াছিলেন। বেলুড়ে মঠ স্থাপিত হইলে সেখানে স্থায়ী ভাবে অবস্থানের সময়ও তিনি কয়েকবার তীর্থ ভ্রমণে যান। স্বামীজী কর্তৃক বেলুড়মঠের জন্য নিযুক্ত ১১ জন ট্রাস্টীর মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন, বালকসুলভ সরলতা, গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও হৃদয়বত্তা সকলকে মুগ্ধ করত। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার বিকাল ৩টা ৫ মিনিটে স্বামী সুবোধানন্দ

বেলুড় মঠে প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে মহাসমাধিতে লীন হন।

সুরেন্দ্র -- [সুরেন্দ্রনাথ মিত্র] (১৮৫০ - ১৮৯০) -- ঠাকুরের গৃহীভক্ত, অনত্যম রসদদার। স্পষ্টবক্তা, প্রথম জীবনে নাস্তিক এবং ডষ্ট কোম্পানীর মুৎসুদ্দী ছিলেন। আনিমানিক ত্রিশ বৎসর বয়সে বন্ধু রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের আগ্রহে অত্যন্ত অবিশ্বাসী মনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান। কিন্তু ঠাকুরের অমৃত বাণী শুনিয়া সমস্ত ভুলিয়া অভিভূত হন। এই সময়ে তিনি সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ মনন করিতে থাকেন। তিনি বহুবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের জন্য যাইতে থাকেন, অপর পক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরও অনেকবার সিমুলিয়ায় তাঁহার এই ভক্তটির বাড়িতে শুভাগমন করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। এই মহামিলনের ফলে সুরেন্দ্রের অশান্তজীবন শান্ত হয় এবং তিনি ঠাকুরকে 'গুরু রূপে' বরণ করেন। সুরেন্দ্রের বাড়িতে ৺অন্নপূর্ণা, ৺জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজা হইত। তাঁহার গৃহেই ঠাকুর প্রথম নরেন্দ্রের (বিবেকানন্দ) গান শুনিয়াছিলেন। উৎসবাদিতে প্রচুর ব্যয় হইলেও সুরেন্দ্র তাহা অতিশয় আনন্দের সহিত বহন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থান কালে তিনি অধিকাংশ খরচ বহন করিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'রসদদার' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে নিজ ব্যয়ে ও উদ্যোগে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম "শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব" প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তী কালেও এই উৎসবের অধিকাংশ খরচ তিনি বহন করিতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরও সুরেন্দ্রনাথ ত্যাগী সন্তানদের সেবার জন্য অনেক টাকা দিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে ঠাকুরের পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

সুরেন্দ্রের মেজো ভাই -- আদালতের জজ স্বগৃহে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বরের বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা করেন।

সেজোগিন্নী (জগদম্বা দাসী) -- রানী রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা এবং রানীর সেজ জামাই মথুরামোহন বিশ্বাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। অতিশয় ধর্মপ্রাণা ভক্তিমতী মহিলা। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি নানাভাবে ঠাকুরের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মথুরামোহনের মত ঠাকুরকেও তিনি 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, ঠাকুরের যখন যাহা প্রয়োজন সব সময়ই সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতেন। এমনকি ঠাকুর কামারপুকুরে থাকাকালীন যাহাতে কোন রকম অসুবিধে না হয়, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। ঠাকুরও এই মহিলা ভক্তটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার সরলতার প্রশংসা করিতেন।

সৌরীন্দ্র ঠাকুর -- পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর বংশের হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র, রাজা এবং স্যার উপাধি প্রাপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। গোলাপ-মার একমাত্র কন্যা চণ্ডীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়।

হঠযোগী -- শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে জনৈক হঠযোগী। কিছুদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং পঞ্চবটীতলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। একদা ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান যোগীন কৌতূহলের বশে হঠযোগীর ক্রিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে ঠাকুর যোগীনকে ওই সব ক্রিয়া দেখিতে বা শিখিতে নিষেধ করেন। ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত কৃষ্ণ কিশোরের পুত্র রামপ্রসন্ন এবং আরও কয়েকজন ওই হঠযোগীকে খুব ভক্তি করিতেন। হঠযোগীর আর্থিক অভাব নিবারণের জন্য রামপ্রসন্ন ভক্তদের বলিয়া হঠযোগীর জন্য টাকার ব্যবস্থা করিতে ঠাকুরকে অনুরোধ করেন। ইহার পর রাখাল এবং হঠযোগী নিজেও একই কথা জানাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কয়েকজন ভক্তকে হঠযোগীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

হনুমান সিং (দারোয়ান) -- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী দক্ষিণেশ্বরের মন্দির রক্ষা কার্যে নিযুক্ত

মহাবীর মন্ত্রের উপাসক ও ভক্ত। পাঞ্জাবী মুসলমান পালোয়ানের সহিত মল্লযুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্বে তিনি ইষ্টমন্ত্র জপ এবং দিনান্তে একবার আহার করিয়া কাটাইতেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগের দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল সম্বন্ধে ঠাকুর হনুমান সিংকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, ঠাকুরের কৃপা থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার জয় হইবে। বলাবাহুল্য তিনি মল্লযুদ্ধে জয়ী হইয়া নিজের দারোয়ানের পদে পূর্বের ন্যায় বহাল ছিলেন।

হরমোহন মিত্র -- শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত গৃহীভক্ত। নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ও বন্ধু। কলিকাতার দর্জি পাড়ায় নয়ন চাঁদ মিত্র স্ট্রীটে বাস করিতেন। হরমোহনের মাতা কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। মাতার উৎসাহেই পুত্র হরমোহন দক্ষিণেশ্বরে বহুবার যান এবং বিশেষ কৃপা লাভে ধন্য হন। একদা ঠাকুর তাঁহাকে স্পর্শ করায় তাঁহার ভিতরে দিব্য অনুভূতির সৃষ্টি হয়। ঠাকুরের কল্পতরু হওয়ার দিন তিনি কাশীপুরে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর এবং স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের জন্য নিজ ব্যয়ে ছাপানো পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ঘরে ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ও ভাবধারা প্রচারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ম্যাক্সমূলার প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী তিনিই সর্বপ্রথম এদেশে প্রচার করেন।

হরলাল -- ব্রাহ্ম ভক্ত, হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনুগামী। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে হরলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতেন। ঠাকুরও তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর হইতে কেশবচন্দ্র সেনের সহিত স্টীমারে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের সময়ে হরলালও উপস্থিত ছিলেন।

হরি -- বাগবাজার নিবাসী ব্রাহ্মণ বংশীয় সন্তান। শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ ধন্য যুবক ভক্ত। ঠাকুরের ভক্ত মুখুজ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, মহেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়। 'মুখুজ্যেদের হরি' নামে কথামৃতে পরিচিত। হরি কখনো একাকী, কখনো মুখুজ্যেদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে যাইতেন। ঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করেন। ঠাকুরের এত স্নেহপাত্র ছিলেন যে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে যাইতে কিছুদিন বিলম্ব হইলে ঠাকুর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। একদা হরি ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভের প্রার্থনা করায় ঠাকুর অসম্মত হন; তবে প্রার্থনা করেন যে যাহারা আন্তরিক টানে তাঁহার নিকট আসিবেন তাহারা যেন সবাই সিদ্ধ হয়। ভাগ্যবান হরির হাত নিজের হাতের উপর রাখিয়া পরীক্ষাপূর্বক ঠাকুর তাঁহার ভাল লক্ষণের কথা জানান এবং তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করেন।

হরি [হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় -- স্বামী তুরীয়ানন্দ] (১৮৬৩ - ১৯২২) -- কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে জন্ম। পিতা চন্দ্রনাথ, মাতা প্রসন্নময়ী। শৈশবেই মাতৃহারা এবং ১২ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। এই হরিনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে পরিচিত। গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) তাঁহার বাল্যবন্ধু। বাল্যকাল হইতেই হরিনাথ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং তত্ত্বান্বেষী। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। ইহার দুই বৎসর পর হইতেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করেন। তাঁহার সঙ্গগুণে সমস্ত সংশয় ও দ্বন্দ্বের অবসান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হয়। হরিনাথ বেদান্ত বিচারে আনন্দ লাভ করিতেন। এইসময়ে নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১২ বৎসর ধরিয়া নানা তীর্থে ঘুরিয়া তপস্যা করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকাতে গিয়া বেদান্ত প্রচার করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। শেষজীবনে তিনি কাশীধামে ছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই, শুক্রবার তিনি মায়ার জগৎ হইতে বিদায় লইলেন।

হরিপদ -- শ্রীরামকৃষ্ণের বালক ভক্ত। মাস্টার মহাশয় কর্তৃক ঠাকুরের নিকট আনীত। দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে যাইতেন। ঘোষপাড়া মতে সাধন-ভজন করিতেন। কথকতা জানিতেন এবং খুব ধ্যান করিতেন।

হরিপ্রসন্ন -- [হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় -- স্বামী বিজ্ঞানানন্দ] (১৮৬৮ - ১৯৩৮) -- শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত। উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায় বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহ ছিল চব্বিশ পরগণার বেলঘরিয়ায়। পিতা তারকনাথ ও মাতা নকুলেশ্বরী দেবী। শৈশবে কাশীতে এবং পরে কলিকতায় বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে পুণায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হইয়া পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি গাজীপুরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের সময় তিনি বাঁকীপুরে ছিলেন। পরে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। এই সময় তিনি "স্বামী বিজ্ঞানানন্দ" এবং গুরুভ্রাতাগণের নিকট "বিজ্ঞান মহারাজ" বা "হরিপ্রসন্ন মহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন। স্বামীজীর আদেশে তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে (এলাহাবাদ) যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে মুঠিগঞ্জে একটি স্থায়ী মঠ স্থাপন হয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহরক্ষার পর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ হন। ঠাকুরের দীক্ষিত ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে তিনিই শেষ অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি পৌস সংক্রান্তির দিন তিনি, স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী বেলুড়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া "আত্মারামের কৌটা" বেদীতে স্থাপনপূর্বক মন্দিরের উদ্বোধন করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার শেষজীবন এলাহাবাদে কাটে। তীব্র বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনযাপনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ হরিপ্রসন্নকে খুব স্নেহ করিতেন এবং আদর করিয়া 'পেসন' বলিয়া ডাকিতেন। অন্যান্য গুরু ভাইদেরও গভীর স্নেহ ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল সোমবার এলাহাবাদেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

হরিবল্লভ বসু -- ঠাকুরের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কটকের উকিল এবং রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত। পিতা বিন্দু মাধব। কলিকাতায় রামকান্ত বসু স্ট্রীটের যে ৫৭ নং বাড়িতে বলরামবাবু সপরিবারে করিতেন এবং কথামৃতে যাহাকে 'বলরাম-মন্দির' বলা হইয়াছে -- তিনিই উহার মালিক ছিলেন। বলরাম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করেন বিশেষতঃ পরিবারস্থ মহিলাদের সেখানে লইয়া যান শুনিয়া হরিবল্লভবাবু বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হয় এবং তিনি ঠাকুরের ভক্ত হন। 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা' হইতে জানা যায়, একদিন ঠাকুর বলরাম-মন্দিরে শুভাগমন করিলে পর গিরিশচন্দ্রের ব্যবস্থামত হরিবল্লভবাবু আসিয়া ঠাকুরের নিকট বসেন এবং উভয়েই উভয়কে দেখিয়া কাঁদিত থাকেন, কোন কথা হয় নাই।

হরিবাবু (হরি চৌধুরী) -- মাস্টার মহাশয়ের প্রতিবেশী ও বন্ধু। মাস্টার মহাশয়ের সহিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান (২০।৮।১৮৮৩)। শ্রীশ্রীঠাকুর ইঁহাকে 'কুমড়োকাটা বঠ্ঠাকুর' না হইয়া ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রাখিয়া সংসারের কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

হরিশ (হরিশ কুণ্ডু) -- কলিকাতার উপকণ্ঠে গড় পারে বাড়ি। ব্যায়াম শিক্ষকের কার্য করিতেন। মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিতেন। সরল শান্ত স্বভাবের জন্য তিনি ঠাকুরের স্নেহভাজন হন। পরবর্তী কালে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে।

হলধারী (রামতারক চট্টোপাধ্যায়) -- শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খুল্লতাত ভ্রাতা। ঠাকুর তাঁহাকে হলধারী

বলিতেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথমে কালীঘরে ও পরে বিষ্ণুঘরের পূজারী হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকজীবনের বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

হলধারীর বাবা -- শ্রীকানাইরাম চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের খুল্লতাত। নিষ্ঠাবান, সরল বিশ্বাসী ভগবদ্ ভক্ত ছিলেন।

হাজরা -- প্রতাপ হাজরা দ্রষ্টব্য।

হীরানন্দ -- সিন্ধুপ্রদেশের এক শিক্ষিত ব্যক্তি। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করেন। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের অনুগামী ব্রাহ্ম ভক্ত। সিন্ধু প্রদেশের 'সিন্ধু টাইমস' এবং 'সিন্ধু সুধার' পত্রিকা দুইটির সম্পাদক ছিলেন। ঠাকুরের নিকট তিনি কয়েকবার আসিয়াছিলেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্তদের সহিত তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অসুস্থ অবস্থায় থাকার সময় ঠাকুর হীরানন্দকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হন এবং সেই সংবাদে হীরানন্দ সুদূর সিন্ধু প্রদেশ হইতে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসেন। ঠাকুর হীরানন্দকে কাছে পাইয়া আনন্দিত হন। ঠাকুরের দেহ রক্ষার পরেও হীরানন্দ কলিকতায় আসিলে বরাহনগর মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।

হৃদয় (হৃদু, হৃদে -- হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়) -- ঠাকুরের পিসতুত বোন হেমাঙ্গিনী দেবীর তৃতীয় পুত্র। পিতা কৃষ্ণচন্দ্র। শিহড় গ্রামে বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলায় হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ঠাকুরের সহচর হিসাবে তাঁহার সেবা ও দেখাশোনা করেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি প্রথমে মা-কালীর বেশ-কারী ও পরে রাধাগোবিন্দজী ও ভবতারিণীর পূজক রূপে নিযুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের আন্তরিক সেবা ভিন্ন সাধনকালে ঠাকুরের শরীর রক্ষা কঠিন হইত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কর্তৃপক্ষীয়দের বিরাগভাজন হওয়ায় কর্মচুত্য হন। দীর্ঘকাল ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করা সত্ত্বেও সংসারের প্রতি হৃদয়ের বিশেষ আসক্তি থাকায় তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে ভুল বুঝিতেন ও তাঁহার প্রতি বিরূপ আচরণ করিতেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিও তাঁহার আচরণ কোন কোন সময় ভাল ছিল না। মাঝে মাঝে ঠাকুরের অনুকরণে নিজেকে আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিষ্ঠা করার নিষ্ফল চেষ্টাও করিতেন। ক্রমে তিনি ঠাকুরের প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করিলে ঠাকুর একসময় গঙ্গায় দেহত্যাগের জন্য গিয়াছিলেন। দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরম ভাগ্যবান হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। হৃদয়ের প্রতি কৃপাপরবশ ঠাকুর, হৃদয়ের শিহড় গ্রামের বাড়িতেও কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরবর্তী কালে হৃদয় কাপড় গামছা বিক্রয় করিলেও দীর্ঘকালের সঙ্গী শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। ঠাকুরের অনুরাগী ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি ঠাকুরের স্মৃতিকথায় মগ্ন হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবিষয়ক অনেক কথা তাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় জন্মভূমি শিহড় গ্রামে ঠাকুরের এই অন্তরঙ্গ সেবক দেহত্যাগ করেন।

হৃদয়ের মা (শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী) -- ঠাকুরের পিসতুতো ভগিনী। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ফুল-চন্দন দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ অবস্থায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে'। ঠাকুরের কৃপালাভে তিনি কৃতার্থ হন।

হেম (রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র কর) -- ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত পল্টুর পিতা।